POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023--2025

আল্লাহ্‌র বাণী

وَرَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ؕ
فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ
وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالَّذِيْنَ
هُمْ بِاٰيٰتِنَا يُؤْمِنُوْنَ

কিন্তু আমার রহমত প্রত্যেক বস্তুকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে; অতএব অচিরেই আমি ইহা ঐ সকল লোকের জন্য নির্ধারিত করিব যাহারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যাকাত দেয় এবং আমার নিদর্শনাবলীর উপর ঈমান আনে।

(সূরা আরফ আয়াত: ১৫৭)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 8

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 26

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 29 ই জুন, 2023 10 যুল হাজ্জা 1444 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

যাচনা করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ

১৪৮০) হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন:

তোমাদের মধ্য থেকে যদি কোন ব্যক্তি রজ্জু নিয়ে সকালে জঙ্গলের দিকে রওনা হয়ে যায় এবং জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করে সেগুলি বিক্রি করে নিজের অন্ন সংস্থান করে এবং সদকাও করে। তার জন্য লোকের কাছে চাওয়ার থেকে এই কাজটি উত্তম।

সদকা কৃত বস্তু ফিরিয়ে নেওয়ার নিষেধাজ্ঞা

১৪৮৯) হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) আল্লাহর পথে একটি ঘোড়া সদকা হিসেবে দেন। অতঃপর তিনি সেটিকে বিক্রি হতে দেখে নিজেই কিনে নিতে চান। তিনি (রা.) নবী করীম (সা.)-এর কাছে এসে এর অনুমতি প্রার্থনা করেন। আঁ হযরত (সা.) বললেন, নিজের সদকা কৃত বস্তু ফিরিয়ে নিও না।

যাকাত দেওয়ার শর্তে বয়আত।

১৪০১) হযরত জারীর বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে, 'আমি নবী (সা.) এর হাতে যত্নসহকারে নামায পড়ার, যাকাত প্রদানের এবং প্রত্যেক মুসলমানদের হিত কামনার শর্তে বয়আত করেছিলাম।'

(সহী বুখারী, ৩য় খণ্ড, কিতাবু যাকাত, কাদিয়ান থেকে মুদ্রিত)

এই সংখ্যায়

খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ৫ মে ২০২২
হুযুর আনোয়ার (আই.) সফর বৃত্তান্ত যুক্তরাষ্ট্র, ২০২২,
প্রশ্নোত্তর

আমি আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে ঘোষণা করেছি যে, আল্লাহ্ আমাকে প্রত্যাদিষ্ট করে পাঠিয়েছেন। কিন্তু যদি এদের মনে আল্লাহ্ তা'লার বিষয়ে কোন শ্রেষ্ঠত্ব থাকত, তবে অস্বীকার করত না। আর খোদার নামে উপহাসকারী হিসেবে গণ্য

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বাণী

পুণ্যকর্ম চেনার উপায়

এরা বোঝেই না- আমার মাঝে ইসলাম বিরুদ্ধ কি আছে? আমরা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' পাঠ করি, নামাযও পড়ি, রমযানে রোযাও রাখি আর যাকাতও দিই। তবে আমি কেবল এতটুকুই ঘোষণা করেছি যে তাদের এই সব কাজগুলি সঠিক অর্থে পুণ্যকর্ম নয়, এগুলি খোলস মাত্র, যার মধ্যে কোনও অন্তঃসার নেই। অন্যথায় এগুলি যদি প্রকৃতই পুণ্যকর্ম হত তবে এর ইতিবাচক পরিণাম কেন প্রকাশ পায় না? এগুলি তখনই সঠিকঅর্থে পুণ্যকর্ম বলে বিবেচিত হবে, যখন তা যাবতীয় ত্রুটি ও সংমিশ্রন থেকে মুক্ত থাকবে। কিন্তু এদের মধ্যে এই সব গুণ কোথায়? আমি কোনভাবেই বিশ্বাস করতে পারি না যে একজন মোমেন মুত্তাকি এবং সৎকর্মশীল,অথচ সে একজন ধার্মিক ব্যক্তির শত্রুতা করবে। যদিও এরা আমাকে বিধর্মী তথা নাস্তিক নামে অভিহিত করে, কিন্তু এরা নিজেরা খোদাকে ভয় করে না। আমি আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে ঘোষণা করেছি যে, আল্লাহ্ আমাকে প্রত্যাদিষ্ট করে পাঠিয়েছেন। কিন্তু যদি এদের মনে আল্লাহ্ তা'লার বিষয়ে কোন শ্রেষ্ঠত্ব থাকত, তবে অস্বীকার করত না। আর খোদার নামে উপহাসকারী হিসেবে গণ্য হওয়ার ভয়ে তারা গুটিয়ে যেত। কিন্তু এটা তখন হয় যখন তাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র উপর প্রকৃত ঈমান থাকে আর তারা পরকালের শাস্তি সম্পর্কে ভয় করে আর لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ আয়াতের শিক্ষাকে তারা শিরোধার্য করে। (বনী ইসরাঈল: ৩৭)

আউলিয়াদেরকে অস্বীকার করা ঈমান হানির কারণ হয়।

তাদের চিন্তাধারা এবং ঈমানী শক্তি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে তারা নবীর অস্বীকারকারীকে কাফের নামে অভিহিত করে, কিন্তু আউলিয়াকে অস্বীকার করা 'কুফর', এমনটি আবশ্যক নয়। তারা মনে করে, এক ব্যক্তিকে অস্বীকার করলে এমন কি আসে যায়? এরা আউলিয়া আল্লাহকে অস্বীকার করা সামান্য বিষয় মনে করে আর প্রশ্ন করে এতে কিসের ক্ষতি হবে? কিন্তু বস্তুত, আউলিয়াদেরকে অস্বীকার করা ঈমান হানির কারণ হয়। যে ব্যক্তি এই বিষয়টির প্রতি অভিনিবেশ সহকারে দৃষ্টি দিবে, সে পরিস্কার দেখতে পাবে, যেমনভাবে আয়নায় নিজের চেহারা দেখতে পায়।

স্মরণ রাখা উচিত যে ঈমান হানি দুই ভাবে হয়। প্রথমত, আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম কে অস্বীকার করলে- একথা তো সর্বজনী স্বীকৃত, কেউই তা অস্বীকার করতে পারবে না। দ্বিতীয়ত, আউলিয়া এবং আল্লহ্‌র প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তিদের অস্বীকার করার কারণে ঈমান হানি ঘটে।

আম্বিয়াদের অস্বীকারের ফলে ঈমান হানি হওয়া সম্পূর্ণ সুস্পষ্ট বিষয়, একথা সর্বজনবিদিত। কিন্তু তবু একথা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম কে অস্বীকার করার কারণে ঈমান হানি এই জন্য হয় যে, নবী দাবি করে, তাঁরা খোদার পক্ষ থেকে এসেছেন আর খোদা তা'লা ঘোষণা করেন, 'যা কিছু এরা বলছেন সেগুলি আমার কথা। এ আমার প্রেরিত নবী, এর উপর ঈমান আন, আমার কিতাবকে মান্য কর, আর আমার বিধিনিষেধ শিরোধার্য কর।' যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লার কিতাবের উপর ঈমান আনে না, তাঁর উপদেশাবলী এবং তাঁর নির্ধারিত সীমা মেনে চলে না, সেই ব্যক্তি এগুলিকে অস্বীকার করে কাফের হয়ে যায়। কিন্তু যে পরিস্থিতিতে আউলিয়া উল্লাহকে অস্বীকার করার কারণে ঈমান হানি হয় তা ভিন্ন। একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'লা বলেন- مَنْ عَادٰى لِيْ وَلِيًّا فَاٰذَنْتُهٗ لِلْحَرْبِ অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার বন্ধুর সাথে শত্রুতা করে, বস্তুত সে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হয়।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩১৩)

কুরআন করীমের এটা এক বিরাট শ্রেষ্ঠত্ব; কুরআন মানুষকে কেবল পাপ থেকেই প্রতিহত করে না, বরং পাপ প্রতিহত করার পন্থাও বলে দেয় আর এমন শিক্ষাই মানবজাতিকে রক্ষা করতে পারে। যে ধর্মগ্রন্থ পাপ থেকে রক্ষার পাওয়া উপায় বলে দিতে পারে না, তা মানুষকে সমস্যায় জর্জরিত করে।

(আগের সংখ্যার পর) সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা বনী ইসরাইলের ৩৩ নং আয়াত

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ؕ وَسَآءَ سَبِيْلًا

অতএব এমন লোকদের জন্য তা হোঁচট খাওয়ার কারণ হওয়া উচিত নয়।

দ্বিতীয় প্রকারের মানুষ তারা, যারা পাপের সুযোগ তৈরী হলে তা কোনভাবেই এড়িয়ে যেতে পারে না। তাই তাদেরকে কাছে ঘেঁসতে না দেওয়ার প্রজ্ঞাটি স্পষ্টতই বোঝা যায়। অতএব, মানুষ পাপের সংস্পর্শে এসে তা এড়িয়ে চলতে পারুক বা না পারুক, উভয় পরিস্থিতিতেই তাকে পাপের ধারে কাছেও যাওয়া উচিত নয়।

একথাও স্মরণ রাখা উচিত যে, যে স্থানে গেলে কোন বিশেষ উপকার চোখে পড়ে, সেদিকে না যাওয়াকে কাপুরুষতা বলা যেতে পারে, কিন্তু যেদিকে যাওয়া বা না যাওয়া বিশেষ কোন কল্যাণ বয়ে আনে না, তা থেকে পৃথক থাকাকে মোটেই কাপুরুষতা বলা যায় না।

وَسَآءَ سَبِيْلًا বাক্যাংশে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নৈতিক পাপ হওয়া ছাড়াও ব্যাভিচারের মধ্যে আরও বহু ক্ষতিকর দিক রয়েছে। যে ব্যক্তি বিয়ে করে সে অবশ্যই এ বিষয়ের প্রতি সচেতন থাকে যে মেয়ের স্বাস্থ্য যেন ভাল হয়, সে যে চিররুগী না হয়, তার স্বভাব-চরিত্র যেন ভাল হয়। অনুরূপভাবে মেয়ের আত্মীয়স্বজনরা ছেলের বিষয়েও যাচাই করে। কিন্তু ব্যাভিচারে সময় এমন কোন বাছবিচার হতে পারে না। কারণ ব্যাভিচার

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

আল্লাহ্ তা'লার কারো সাহায্যের প্রয়োজন নেই,তবু নবুওয়তের ধারাবাহিকতার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লারই মানুষকে সুযোগ দিয়ে থাকেন।

একটি কথা আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত, আল্লাহ্ তা'লা কোন মানুষের সাহায্যের মুখাপেক্ষী নন।

তাদের নিজ থেকেই আত্ম-বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে যে, আমরা কি সর্বকপ্রকার পাপকর্ম থেকে আত্মরক্ষা করে আমাদের এই জামাত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পুরণকারী হতে পেরেছি?

অব্যই এই জামাত- এই সিলসিলা আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং সাহায্য ও সমর্থন দিয়ে দাঁড় করিয়েছেন আর এর সপক্ষে সাহায্য ও সমর্থনের দৃশ্য দেখিয়েও যাচ্ছেন,তাই আমাদের কাছেও প্রত্যাশিত যে, এই মহান বিপ্লবের উদ্দেশ্য ও মর্যাদার প্রতি নিষ্ঠাবান থেকে আমরা বিশ্বকে এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে জ্ঞাত করি।

সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) ১১ই সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে মজলিস আনসারুল্লাহ্ যুক্তরাজ্যের বাৎসরিক ইজতেমায় ভাষণ প্রদান করেন।

আল হামদোলিল্লাহ! যুক্তরাজ্যের আনসারুল্লাহ'র ইজতেমা তিন দিন পূর্বে শুরু হয়ে আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ ও আশিসে আজ সমাপ্তিতে পৌঁছেছে। প্রতি বছরএখানেও আর বিশ্বের অন্যান্য দেশেও আনসারুল্লাহ'র ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। আনসার প্রচুর সংখ্যায় এতে সমবেত হন আর ইজতেমার অনুষ্ঠানসমূহে অংশও নিয়ে থাকেন। কিন্তু আমাদের মধ্যে কতজন রয়েছেন যারা আনসারুল্লাহ'র উদ্দেশ্য কী আ কী'বা তাদের দায়িত্ব; এটা নিয়ে চিন্তাভাবনা করেন। 'আনসার' যেমনটা আপনারা জানেন, এটা 'নাসের' এর বহুবচন যার অর্থ হল 'সাহায্যকারী'। অতবে, 'আনসারুল্লাহ'র অর্থ দাঁড়ায় আল্লাহ্ তা'লা সাহায্যকারী সংঘ।

সাংগঠনিকভাবে 'আনসার' এর শুরুটা হয় ৪০ বছর বয়স পার হওয়ার পর থেকে। সাধারণ অর্থে প্রত্যেক ব্যক্তি, যে-ই হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বয়আত গ্রহণের আওতাধীন হয়েছে, বয়সে সে এর চেয়ে ছোটই হোক, পুরুষ কিংবা নারীই হোক, বয়আতের অঙ্গীকার পালনে নিজেকে সোপর্দ করে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-রে মিশনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এবং বিস্তার দানে তার সচেষ্ট থাকা উচিত।

তবে আনসারুল্লাহ্, ৪০ বছর বয়স থেকে যার শুরু, তা এমন এক বয়স,যোগ্যতা এবং চিন্তা-চেতনা ও পরিপক্কতার শীর্ষে এর অবস্থান, আর এ কারণে তাদেরকে নিয়ে যে সংগঠন তার নামটিও 'আনসারুল্লাহ'।

তাদের ভাবা উচিত, আপনাদের সচেতন থাকা উচিত এই বলে যে- আমাদের দায়-দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ কী? কেবই নিজেদেরকে আনসারুল্লাহ্ আখ্যায়িত করাটাই কী আমাদের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য সম্পাদনকারী বানিয়ে দিতে পারে?

একটি কথা আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত, আল্লাহ্ তা'লা কোন মানুষের সাহায্যের মুখাপেক্ষী নন। গত পরশু দিনই খুতবাতে আমি উল্লেখ করেছি যে, আল্লাহ্ তা'লা চাইলে ধর্মের সেবাকারীদের জন্য সরাসরি উপকরণ যোগান দিতে পারেন, সকল কিছুর মালিক তিনি, আর তাদের কাজকে তিনি সহজও করে দিতে পারেন। পবিত্র কুরআন থেকে এমনটাই জানা যায়, আল্লাহ্ তা'লাই তাঁর নবী ও নবীর জামাতকে সান্ত্বনা দিয়ে থাকেন- 'আমি তোমাদের সাহায্যকারী'। কাফেররা সংখ্যা গরিষ্ঠতার জোরে নবী ও নবীর জামাতকে ভয় দেখালে নবীর জবাব এটাই হয়ে থাকে যে, 'তোমরা আমাকে তোমাদের মাঝে ফিরিয়ে নেওয়ার যে কথা বলছ, তবে আমার এমনটা করায়, আল্লাহ্ তা'লার শাস্তি থেকে আমাকে বাঁচাতে তোমরা বা অন্য কেউ সাহায্য করতে পারবে কী?'

অতএব, আল্লাহ্ তা'লার কারো সাহায্যের প্রয়োজন নেই,তবু নবুওয়তের ধারাবাহিকতার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লারই মানুষকে সুযোগ দিয়ে থাকেন, যাতে জগতে ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তোমরা সামান্য কোন চেষ্টা করলেই আল্লাহ্ তা'লা তোমাদেরকে এত বেশি পুরস্কৃত করেন যে, সৃষ্ট জগতে তুচ্ছাতিতুচ্ছ যার অবস্থান, আমাদের মত সেই অতি সাধারণ মানুষগুলোকেও আল্লাহ্ তা'লার তাঁর নিজের সাহায্যকারীগণের মধ্যে গণ্য করে নেন। অতএব এই প্রেক্ষাপটের দিকে দৃষ্টি রেখে আমাদের নিজেদেরকে নিরীক্ষণ করা জরুরী।

এই যে যুগ, যা ইসলামের পুনর্জাগরণ ও পুনর্বিজয়কাল, আল্লাহ্ তা'লা নিজ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী যার সূচনা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর মাধ্যমে ঘটিয়েছেন, আমাদেরকে পরিপক্ক বয়সও দিয়েছেন, এমতাবস্থায় আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ কী? অব্যই এই জামাত- এই সিলসিলা আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং সাহায্য ও সমর্থন দিয়ে দাঁড় করিয়েছেন আর এর সপক্ষে সাহায্য ও সমর্থনের দৃশ্য দেখিয়েও যাচ্ছেন,তাই আমাদের কাছেও প্রত্যাশিত যে, এই মহান বিপ্লবের উদ্দেশ্য ও মর্যাদার প্রতি নিষ্ঠাবান থেকে আমরা বিশ্বকে এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে জ্ঞাত করি।

জগৎ সমক্ষে আল্লাহ্ তা'লার একত্বের ঘোষণা দিয়ে, তাদেরকে এদিকে ডাকুন, ইসলামের অনুপম সৌন্দর্যপূর্ণ শিক্ষা তাদের সামনে তুলে ধরুন। মহানবী (সা.)-এর মহান মর্যাদা আর 'খাতামুর রসুল' হওয়ার প্রকৃত তাৎপর্য ও তত্ত্বজ্ঞান মুসলমানদের ও অ-মুসলমানদের মাঝে সঞ্চারিত করুন, সেই সাথে নিজেরও হিসাব নিন-'তৌহিদ' (আল্লাহ্ তা'লার একত্ব) নিজ মাঝে কতটা মজবুতির সাথে রয়েছে আর আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসা ও গুণ-গান কতটা মনোযোগের সাথে করা হচ্ছে এবং ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষামালার উপর কতটা আমল করে জীবন কাটানো হচ্ছে? মহানবী (সা.) এর প্রতি আমাদের প্রেমানুরাগ তাঁর প্রতি দরূদ পাঠে আমাদেরকে কতটা নিমগ্ন রাখছে আর তাঁর (সা.) আদর্শ ও নমুনা আত্মস্থ করার প্রতি আমরা কতটা মনোযোগ দিচ্ছি?

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আমাদের কাছে কী প্রত্যাশা করেছেন এ প্রসঙ্গে আমি এখন আপনাদের সামনে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর কতিপয় উদ্ধৃতি তুলে ধরছি, যাতে তিনি (আ.) তাঁর জামাত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। সেসব বর্ণনায় তিনি আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। আমরা যদি এই চেতনাবোধ থেকে তাঁর (আ.) প্রদত্ত প্রত্যেকটি উপদেশে ভাল ও মন্দ বিষয়ের উল্লেখ করে যে প্রতিচ্ছবি তুলে ধরা হয়েছে, সেই আলোকে নিজেদেরকে নিরীক্ষণকারী হই ও সংশোধনকারী হতে চাই তবে প্রকৃতই আমাদের সংশোধন হওয়া সম্ভব। প্রকৃত অর্থেই আমরা আনসারুল্লাহ্ হয়ে উঠবো। সত্যিকার আনসারুল্লাহ্'র রঙে রঙীন হয়ে আমরা অন্যদের তরবীয়তকারীতে পরিণত হতে পারব। যাইহোক কতিপয় উদ্ধৃতি তুলে ধরছি-

তিনি বলেন, কু-প্রবৃত্তি প্রভাব বিস্তারে এমন এক আধিপত্য রাখে যে, মানুষকে তা ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। মানব অন্তরকে অস্থির ও দিশেহারা করে তাকে কাবু করে ফেলে। এজন্যই কেউ কেউ বলে থাকে শয়তান আক্রমণ করেছে আবার অন্য কোনভাবেও বিষয়টিকে কেউ কেউ উল্লেখ করে থাকে। তবে মানতে হবে যে, আজকাল কু-প্রবৃত্তির তাড়নার ঢল নেমেছে। শয়তান তার প্রভাব প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠায় তৎপর। অপকর্ম আর নির্লজ্জতা মহাঘুর্ণির ন্যায় চতুর্দিক থেকে প্রবল বেগে ধেয়ে আসছে। আল্লাহ্ তা'লা যিনি সর্বপ্রকার বিপদ-আপদ কালে মানুষকে রক্ষা করে থাকেন, অতএব, কতই না জরুরী যে, ভয়াবহ এই সংকট কালেও তিনিই রক্ষা করবেন। অএব, নিজ অনুগ্রহেই সংকটময় এই কালে তিনি এই জামাত প্রতিষ্ঠা করেছেন।

আল্লাহ্ তা'লা বিপদগ্রস্থ এই লোকদেরকে, এই বান্দাদেরকে যারা নিজেদেরকে শয়তানের কবল হতে রক্ষা করতে চায়, তিনি তাদেরই রক্ষার্থে এই জামাত প্রতিষ্ঠিত করেছেন। যেমনটি আমি বলেছি, আনসারের বয়সে এক পরিকপক্কতা থাকে।অতএব, তাদের নিজ থেকেই আত্ম-বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে যে, আমরা কি সর্বকপ্রকার পাপকর্ম থেকে আত্মরক্ষা করে আমাদের এই জামাত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পুরণকারী হতে পেরেছি?

এই সাথে মহানবী (সা.)-এর সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার জন্যও এই জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন,আল্লাহ্ তা'লাই এই জামাত এই উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, মহানবী (সা.) এর নবুওয়ত আর তাঁর উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় মর্যাদা পুনরায় তিনি জগতে প্রকাশিত করবেন, প্রতিষ্ঠিত করবেন। এক ব্যক্তি যে 'প্রেমিক' হওয়ার দাবি করে আর যদি সেই প্রেমিকের 'প্রেমাস্পদ' এর অনুরূপ হাজার হাজার সংখ্যায় 'ভালবাসার মানুষ' থাকে তাহলে তার ভালবাসার বিশেষত্ব কী রইল (কোন প্রেমিকের যদি বহু সংখ্যক প্রেমাস্পদই থাকে তাহলে তার ভালবাসার উল্লেখযোগ্য কোনও বৈশিষ্ট্যই তো আর রইল না) । এজন্যই তিনি (আ.) বলেন, যদি এরা রসুলুল্লাহ্ (সা.) ভালবাসায় এবং প্রেমে বিভোরই হয়ে থাকে, সাধারণভাবে যেমন তারা-সব মসলমানরা এই দাবিই করে থাকে,তাহলে এটা কেমন কথা যে,

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁহযরত (সা.) বলেন- 'আমি আল্লাহ্ তা'লার নিকট 'লাওহে মাহফুয' এ সেই সময় খাতামান্নাবীঈন আখ্যায়িত হয়েছি যখন আদম সৃষ্টির উন্মেষ লগ্নে ছিলেন। (মুসনাদে আহমদ)

দোয়াপ্রার্থী: Shujauddin and Family , Barisha (Kolkata)

জুমআর খুতবা

বিশ্বের সব দেশে শূরা আয়োজনের উদ্দেশ্য হলো আমাদের ব্যবহারিক অবস্থা সংশোধনের লক্ষ্যে পরিকল্পনা গ্রহণের পাশাপাশি এক আল্লাহ্‌র বাণী প্রচারের জন্য এবং বিশ্ব বাসীকে এক উম্মতে পরিণত করার মানসে, মহানবী (সা.)-এর পতাকাতলে সমবেত করার উদ্দেশ্যে এমন পরিকল্পনা গ্রহণ করা যা একটি বিপ্লব সাধন করবে।

এটি আমাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ অনুগ্রহ যে, আমাদের মাঝে শূরার ব্যবস্থাপনা চলমান রয়েছে। অতএব সামগ্রিকভাবে প্রত্যেক আহমদীর আর বিশেষভাবে শূরার প্রত্যেক সদস্যের উচিত এর মূল্যায়ন করে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া। কেননা তিনি আমাদের জন্য হিদায়াত ও সঠিক পথ প্রাপ্ত হওয়ার উপকরণ সৃষ্টি করেছেন।

সাহাবীদের আদর্শ আমাদের সামনে স্পষ্ট করে যে, তারা যখন মহানবী (সা.)-এর নির্দেশে পরামর্শ দিতেন তখন নিজ যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী তাকওয়ায় প্রতিষ্ঠিত থেকে পরামর্শ প্রদান করতেন।

সত্য-সঠিক পথ ও হেদায়েতের প্রসারের যে দায়িত্ব` হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর স্কন্ধে ন্যস্ত হয়েছে আমরা তাতে সহযোগী ও সাহায্যকারী হতে পারবো। এমনটি না হলে শূরার সদস্য হওয়া নিরর্থক।

নিজেদের ব্যবহারিক আচরণ (উপস্থাপন), মানুষের সাথে ভালোবাসা ও আন্তরিকাতপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা, তাদের জন্য হৃদয়ে মমতা রাখা এবং তাদের ও নিজেদের জন্য দোয়া করা আর যুগ-খলীফার আনুগত্যের মান সুউচ্চ করা যখন প্রত্যেক কর্মকর্তা ও শূরার সদস্যের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হবে কেবল তখনই জামা'তের মাঝে আমরা সামগ্রিকভাবে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন লক্ষ্য করব।

নিজ ব্যবহারিক দৃষ্টান্তের প্রতি, নিজ আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিক অবস্থার প্রতি সর্বদা দৃষ্টি রেখে জীবন যাপন করার অঙ্গীকার করুন এবং যেসব সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে বা হয়েছে, তাকওয়ার পথে ধাবমান হয়ে সেগুলো বাস্তবায়ন করার এবং করানোর চেষ্টা করুন।

এতে তাদের জন্যও শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে যারা শূরার প্রতিনিধি নির্বাচন করে। অর্থাৎ (তারা) যেন নিজেদের মধ্য থেকে এমন লোকদের নির্বাচন করে যারা বাহ্যত সুপরামর্শদাতা, ধর্মীয় জ্ঞানে উত্তম এবং তাদের ইবাদতের মানও উন্নত।

যেখানেই আমাদের শূরার সদস্যরা রয়েছেন তাদেরও সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, তারা যেমন পরামর্শ প্রদান করেন, তেমনি সবার আগে নিজেদের এর জন্য প্রস্তুত করুন যে, আমরা এসব পরামর্শের অনুমোদনের পর আমল করব। অথবা যুগ খলীফা যা-ই সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন সবার আগে আমাদেরকে তার ওপর আমল করার জন্য সকল ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। তাদের ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত যখন স্থাপিত হবে তখনই জামা'তের সাধারণ সদস্যরাও সানন্দে এর ওপর আমল করার জন্য সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকবে।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে **মুবারকে প্রদত্ত ১২ ই মে, ২০২৩, এর জুমআর খুতবা (১২ হিজরত ১৪০২ হিজরী শামসী)**

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করেন,

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ۪ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ ۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ

(এই) আয়াতের অনুবাদ হলো, অতএব আল্লাহ্‌র পরম কৃপায় তুমি তাদের প্রতি কোমলচিত্ত হয়েছ, আর তুমি যদি রূঢ় ও কঠোরচিত্ত হতে তাহলে নিশ্চয় তারা তোমার আশপাশ হতে ছত্রভঙ্গ হয়ে যেতো। অতএব (তুমি) তাদের মার্জনা করো এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো আর সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ করো। এরপর তুমি যখন (কোনো বিষয়ে) সংকল্পবদ্ধ হও তখন আল্লাহ্‌রই ওপর ভরসা করো। নিশ্চয় আল্লাহ্ ভরসাকারীদের ভালোবাসেন। (সূরা আলে ইমরান : ৬০)

আজকাল বিভিন্ন দেশে জামা'তের মজলিসে শূরা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কোনো কোনো দেশে শূরা হয়ে গেছে আবার কোথাও এই সপ্তাহে হবে আর কোনো কোনো দেশে হবে আগামী সপ্তাহে। আজ থেকে এর (খুতবার) মাধ্যমে জার্মানিতে শূরা আরম্ভ হচ্ছে, একইসাথে আরো অনেক দেশ রয়েছে(যেখানে শূরা অনুষ্ঠিত হচ্ছে)। অনুরূপভাবে যুক্তরাজ্য ও অন্যান্য কিছু দেশে মজলিসে শূরা আগামী সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হবে ।

শূরার গুরুত্ব এবং প্রতিনিধিবৃন্দের দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে আমি পূর্বেও বিভিন্ন খুতবায় মনোযোগ আকর্ষণ করেছি, কিন্তু এখন যেহেতু (এর পর) কয়েক বছর পার হয়ে গেছে তাই আমি আজ পুনরায় এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লার আদেশ, মহানবী (সা.)-এর আদর্শ এবং জামা'তের ঐতিহ্য ও রীতিনীতিসম্পর্কে কিছু বর্ণনা করা যুক্তিযুক্ত মনে করছি। যেসব স্থানে (ইতোমধ্যে) শূরা হয়ে গেছে সেখানকার শূরার প্রতিনিধিবৃন্দও এসব কথা থেকে লাভবান হতে পারেন, যা শূরার প্রতিনিধিদের দায়-দায়িত্বের প্রেক্ষাপটে প্রতিনিধিদের স্মরণ রাখা উচিত। যেহেতু প্রতিনিধিবৃন্দের কতক দায়-দায়িত্ব মজলিসে শূরার বিভিন্ন সুপারিশ এবং সে বিষয়ে খলীফার সিদ্ধান্তের পরেই আরম্ভ হয়, আর সেগুলো সম্পাদন করা এবং নিজেদের ভূমিকা পালন করা শূরার প্রত্যেক প্রতিনিধির জন্য আবশ্যক।

যাহোক, এসব দায়-দায়িত্বের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করার পূর্বে আমি যে আয়াত পাঠ করেছি তার আলোকে কিছু বিষয় উপস্থাপনকরবো এবং মহানবী (সা.)-এর আদর্শ এবং তাঁর রীতিনীতি তুলে ধরবো। এই আয়াতে যেখানে এ বিষয়ের সত্যায়ন করা হয়েছে যে, মহানবী (সা.) আল্ল াহ্ তা'লার বিশেষ অনুগ্রহে উম্মতের জন্য পরম কোমলচিত্ত ছিলেন, সেখানে এ বিষয়ের প্রতিও আল্লাহ্ তা'লা আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেনএবং নির্দেশনা প্রদান করেছেন যে, যাদের ওপর মহানবী (সা.)-এর কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব, সেই সাথে তাঁর

(সা.) বিভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তাঁর (সা.)-এর দাসত্বে আগমনকারী প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্দীর মিশনও বাস্তবায়ন করা (যাদের দায়িত্ব), তাদেরও (আবশ্যকীয়) দায়িত্ব হলো ভালোবাসা, প্রীতি ও কোমলতার ভিত্তিতে কাজ করা।

আল্লাহ্ তা'লা বলেন, যদি কোমলতা প্রদর্শন না করা হয় বরং কঠোরচিত্ততা প্রদর্শন করো আর (যদি) ক্রোধান্বিত হও তাহলে এসব লোক দূরে সরে পড়বে। অতএব আল্লাহ্ তা'লা ক্ষমা ও মার্জনার দোয়া করার নির্দেশ দিয়েছেন আর পাশাপাশি পরামর্শ করারও নির্দেশ দিয়েছেন।

কাজেই, এই নীতি ও শিক্ষার অধীনে মজলিসে শূরা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। কিন্তু যেমনটি নাম থেকে সুস্পষ্ট, এটি পরামর্শ সভা মাত্র, সিদ্ধান্ত প্রদানকারী নয়। এজন্যই বলেছেন, পরামর্শের পর তুমি যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে তাতে আল্লাহ্র ওপর ভরসা করে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাও। আর আল্লাহ্ তা'লার ওপর ভরসা করা হলে তিনি তার ফলাফলও পরম আশিসময় সৃষ্টি করবেন।

খোদানির্ভরতার সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত আমরা মহানবী (সা.)-এর ব্যক্তিসত্তায় দেখতে পাই। মহানবী (সা.) অনেক বিষয়ে আল্লাহ্ তা'লার কাছ থেকে সরাসরি দিকনির্দেশনা লাভ করতেন। কিন্তু বিশেষভাবে সেসব বিষয়ে তিনি (সা.) অবশ্যই পরামর্শ চাইতেন, যেসব ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লার কোনো স্পষ্ট নির্দেশনা না থাকতো। জামা'তের সদস্যদের সাথে জামা'তের কর্মকর্তাদের আচারব্যবহার কেমন হওয়া উচিত তা আমাদেরকে বোঝানোর জন্য তাঁর (সা.) এই কর্মপন্থা এবং আল্লাহ্ তা'লার এই নির্দেশ। এছাড়াও এর কারণ হলো, আমাদের পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ করা উচিত।

এটি আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ যে, আহমদীয়াজামা'তকে আল্লাহ্ তা'লা খিলাফতের নিয়ামতে ভূষিত করেছেন, তাই যুগ -খলীফাও আল্লাহ্ তা'লার আদেশ এবং মহানবী (সা.)-এর সুন্নত অনুসারে বিশ্ব জুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা জামা'তের নিকট থেকে স্থানীয় অবস্থানুসারে পরামর্শ গ্রহণ করেন।

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ্ তা'লা চাইলে সকল ক্ষেত্রে মহানবী (সা.)-কে দিকনির্দেশনা প্রদান করতে পারতেন। কিন্তু কোনো কোনো বিষয়ে তাঁকে পরামর্শ করার নির্দেশ প্রদান আর কোনো কোনো বিষয়ে তাঁর (সা.) পরামর্শ গ্রহণ করা সত্যিকার অর্থে আমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করার এবং পারস্পরিক সহযোগিতা ও পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ করার প্রতি নির্দেশনা প্রদানের জন্য, অধিকন্তু উম্মতের মাঝে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য ছিল। এ সম্পর্কিত একটি হাদীস থেকে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) রেওয়ায়েত করেন যে, যখন شَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তখন মহানবী (সা.) বলেন, যদিও আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল এর ঊর্ধ্বে , কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা এটিকে আমার উম্মতের জন্য রহমতের কারণ বানিয়েছেন। অতএব, এদের মধ্য হতে যারা পরামর্শ করবে তারা সঠিক পথ ও হিদায়াত থেকে বঞ্চিত থাকবে না। কিন্তু যারা পরামর্শ করবে না তারা লাঞ্ছনা থেকে রক্ষা পাবে না।

(আল জামিউ লি শুবিল ঈমান, ১০ম খণ্ড, পৃ: ৪১, হাদীস-৭১৩৬)

কাজেই, মহানবী (সা.) নিঃসন্দেহে এসব পরামর্শের ঊর্ধ্বে ছিলেন এবং আছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি পরামর্শ গ্রহণ করেছেন যেন উম্মতের জন্য সেই আদর্শ রেখে যেতে পারেন যা থেকে উম্মত সর্বদা আল্লাহ্ তা'লার রহমত বা আশিস লাভ করতে পারে এবং সবসময় সত্য ও হিদায়াতের পথে চলে এবং লাঞ্ছনা হতে রক্ষা পেতে থাকে।

এটি আমাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ অনুগ্রহ যে, আমাদের মাঝে শূরার ব্যবস্থাপনা চলমান রয়েছে। অতএব সামগ্রিকভাবে প্রত্যেক আহমদীর আর বিশেষভাবে শূরার প্রত্যেক সদস্যের উচিত এর মূল্যায়ন করে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া। কেননা তিনি আমাদের জন্য হিদায়াত ও সঠিক পথ প্রাপ্ত হওয়ার উপকরণ সৃষ্টি করেছেন।

মহানবী (সা.) কোন কোন পরিস্থিতিতে পরামর্শ গ্রহণ করেছেন আর তাঁর পরামর্শ (গ্রহণের) রীতি কী ছিল– এ সম্পর্কে ইতিহাস থেকে আমরা যা জানতে পারি তার কিছুটা বর্ণনা করছি। খোলাফায়ে রাশেদীনও সেই রীতিই চলমান রেখেছেন আর এরপর এ যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-ও তারই অনুসরণ করেছেন।

সাধারণত পরামর্শ গ্রহণের জন্য তিনটি রীতি আমরা দেখতে পাই। একটি রীতি ছিল, পরামর্শের যোগ্য কোনো বিষয় সামনে এলে তখন এক ব্যক্তি লোকদের সমবেত হওয়ার উদ্দেশ্যে ঘোষণা দিত,তখন লোকজন জড়ো হতো। এরপর যে মতামত (প্রদান করা) হতো, যে পরামর্শ (দেওয়া) হতো সে সম্পর্কে মহানবী (সা.) অথবা খলীফাগণ সিদ্ধান্ত প্রদান করতেন যে, এসব পরামর্শের ভিত্তিতে আমাদের সিদ্ধান্ত এটি, আর এভাবে এটি বাস্তবায়ন করা হবে। সেই যুগে যেহেতু মাতব্বরি প্রথা ছিল তাই যদিও গোত্রের লোকেরা সমবেত হতো, অনেক মানুষ জড়ো হতো, তবে সাধারণত গোত্রপতি কিংবা আমীরই রায় প্রদান করতেন; তাদের একজন প্রতিনিধি থাকতো। আর মানুষ এতে সানন্দে সম্মত হতো যে, আমাদের নেতা বা আমীর আমাদের প্রতিনিধি হিসেবে রায় বা মতামত ব্যক্ত করবে। বরং সেই যুগের রীতির বিরুদ্ধে গিয়ে কেউ যদি আবেগের বশে ব্যক্তিগত মতামত দেওয়ার চেষ্টাও করতো তাহলে মহানবী (সা.) বলতেন, তোমার নেতা বা আমীরকে বলো, সে যেন এগিয়ে এসে নিজের মতামত প্রদান করে। তোমার কথার সেরূপ কোনো গুরুত্ব নেই। অতএব এটি ছিল একটি রীতি।

দ্বিতীয় পদ্ধতি ছিল এটি যে, যাদেরকে মহানবী (সা.) পরামর্শ দেয়ার যোগ্য মনে করতেন তাদেরকে ডেকে নিতেন এবং গণহারে সবাইকে ডাকা হতো না। এরপর কয়েকজনের বৈঠক বসতো আর পরমার্শ নেওয়া হতো।

তৃতীয় পদ্ধতি হলো, যেখানে মহানবী (সা.) মনে করতেন, দুই ব্যক্তিরও এক স্থানে একত্রিত হওয়ার প্রয়োজন নেই, সেখানে তিনি (তাদেরকে) পৃথকভাবে ডেকে পরামর্শ নিতেন। প্রথমে একজনকে ডেকে পরামর্শ নিতেন। এরপর দ্বিতীয় জনকে ডেকে পরামর্শ নেওয়া হতো। যাহোক তাঁর (সা.) পরামর্শ গ্রহণের এই ছিল তিনটি পদ্ধতি। আর খোলাফায়ে রাশেদীনও এই রীতি অনুযায়ীই পরামর্শ গ্রহণ করেছেন। যেমনটি বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.) এসব পরামর্শের মুখাপেক্ষীনন, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা ইতিহাস থেকে জানতে পারি যে, তিনি (সা.) বিভিন্ন উপলক্ষে পরামর্শ গ্রহণ করেছেন; সত্য কথা হলো, তিনি (সা.) সাহাবীদের কাছ থেকে অনেক বেশি পরামর্শ গ্রহণ করতেন। যেমন হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন যে, আমি মহানবী (সা.)-এর চেয়ে অধিক আর কাউকে নিজ সাহাবীদের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণকারী হিসেবে পাইনি।

(সুনান আততিরমিযি, আবওয়াবুল জিহাদ, হাদীস-১৭১৪)

এর কারণ হলো, যেমনটি আমি বলেছি, যদি আল্লাহ্ তা'লার নবী, যিনি সরাসরি আল্লাহ্ তা'লার দিকনির্দেশনা পেয়ে থাকেন, তিনি পরামর্শ গ্রহণ করেন– তাহলে তোমাদের পরামর্শ গ্রহণের গুরুত্বকে কতটা অনুধাবনের চেষ্টা করা উচিত! তাঁর (সা.) পরামর্শ গ্রহণের একটি ঘটনা উপস্থাপন করছি। এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত মুআয বিন জাবাল (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) যখন আমাকে ইয়েমেনে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তখন মহানবী (সা.) বহু সাহাবীর কাছে পরামর্শ চান। সেই সাহাবীদের মাঝে হযরত আবু বকর (রা.), উমর (রা.), উসমান (রা.), তালহা (রা.), যুবায়ের (রা.) এবং আরও অনেক সাহাবী ছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) নিবেদন করেন, যদি মহানবী (সা.) আমাদের কাছে পরামর্শ না চাইতেন তাহলে আমরা কোনো কথাই বলতাম না। এতে তিনি (সা.) বলেন, যেসব বিষয়ে আমার প্রতি ওহী হয় না সেগুলোর ক্ষেত্রে আমি তোমাদের মতোই হয়ে থাকি।

মুআয (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) এর উক্তি 'আমাকে পরামর্শ দাও'– এর অনুবর্তিতায় মহানবী (সা.) যখন পরামর্শ গ্রহণ করছিলেন তখন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ মতামত ব্যক্ত করে। এরপর মহানবী (সা.) বলেন, মুআয! তুমি বলো, তোমার মতামত কী? তখন আমি নিবেদন করি, আমার মতামত তা-ই যা হযরত আবু বকর (রা.)-এর মত।

(আল মুজামুল কবীর লিতিবরানী, খন্ড-২০, পৃ: ৬৭, হাদীস-১২৪)

অতএব তিনি (সা.) তাকেও জিজ্ঞেস করেছিলেন। সুতরাং মহানবী (সা.)-এর এই অভিব্যক্তি একদিকে যেমন তাঁর সরলতা ও বিনয় এবং পরামর্শের গুরুত্বকে স্পষ্ট করে, তেমনিভাবে এটি আমাদের জন্যও এক উত্তম আদর্শ যে, পরামর্শ গ্রহণকে আমাদের কতটা গুরুত্ব প্রদান করা উচিত! সাহাবীদের আদর্শ আমাদের সামনে স্পষ্ট করে যে, তারা যখন মহানবী (সা.)-এর নির্দেশে পরামর্শ দিতেন তখন নিজ যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী তাকওয়ায় প্রতিষ্ঠিত থেকে পরামর্শ প্রদান করতেন।

এরপর মদিনায় হিজরতের পরও যখন মক্কার কাফেররা মুসলমানদের শান্তি ও শৃঙ্খলাকে নষ্ট করার চেষ্টা করে তখন মহানবী (সা.) এটিকে প্রতিহত করার জন্য সাহাবীদের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করেছেন আর আনসার ও মুহাজির সর্দারদেরও এতে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এরপর মুহাজির ও আনসারদের সর্দারদের পরামর্শ ও সম্মতিক্রমে তিনি বদরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। আর আনসারসর্দাররা এই পরামর্শ প্রদানকালে যে নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন এবং অঙ্গীকার করেন তাতে মহানবী (সা.) পরম আনন্দ ও সন্তুষ্টিরও বহিঃপ্রকাশ করেন।

[সীরাত খাতামান্নাবীঈন, প্রণেতা- হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ (রা.)]

নিছক পরামর্শ দেওয়াই মূলত পরামর্শ প্রদান নয়, বরং এর কারণ হলো, এটি পরামর্শ দাতাদের আচরণ ও তা পালন, অর্থাৎ এই পরামর্শের ওপর সর্বাগ্রে নিজেদের আমল করার অঙ্গীকার।

যদি আমল করার অঙ্গীকার না থাকে আর বাস্তবিক অর্থে এর ওপর আমল না করা হয় তাহলে পরামর্শের কোনো লাভ নেই। আর আমরা দেখেছি যে, কীভাবে বদরের প্রান্তরে সাহাবীরা কার্যতঃ নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার বহিঃপ্রকাশ করেছেন। পরামর্শ দিয়েছেন, এরপর এর জন্য নিজেদের জীবনও বাজি রেখেছেন। অতএব যেখানেই আমাদের শূরার সদস্যরা রয়েছেন তাদেরও সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, তারা যেমন পরামর্শ প্রদান করেন, তেমনি সবার আগে নিজেদের এর জন্য প্রস্তুত করুন যে, আমরা এসব পরামর্শের অনুমোদনের পর আমল করব।

অথবা যুগ খলীফা যা-ই সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন সবার আগে আমাদেরকে তার ওপর আমল করার জন্য সকল ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। তাদের ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত যখন স্থাপিত হবে তখনই জামা'তের সাধারণ সদস্যরাও সানন্দে এর ওপর আমল করার জন্য সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকবে। শূরার সদস্যদের একথা সর্বদা দৃষ্টিপটে রাখা উচিত যে, প্রত্যেক আহমদীর খিলাফতের প্রতি বিশ্বস্ত তা ও আনুগত্যের অঙ্গীকার রয়েছে। তাই এর সবচেয়ে উন্নত দৃষ্টান্ত কর্মকর্তা ও শূরার সদস্যদের স্থাপন করা উচিত, কেননা আপনাদেরকে সেই প্রতিষ্ঠানের সদস্য করা হয়েছে যা খিলাফত ব্যবস্থা ও জামা'তের ব্যবস্থাপনার সাহায্যকারী সংগঠন।

সর্বদা স্মরণ রাখবেন, যুগ-খলীফাকে যেমন মহানবী (সা.)-এর সুন্নতের অনুসরণে ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডে উম্মতের লোকদের পরামর্শ গ্রহণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং একইসাথে নম্র থাকার ও দোয়া করারও নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তেমনিভাবে যাদের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করা হয়তাদের জন্যও নির্দেশ রয়েছে যে, সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে তাকওয়ার পথে থেকে পরামর্শ দেবে।

অতএব পরামর্শদাতাদের সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, তাদের পরামর্শ সৎ উদ্দেশ্যে এবং তাকওয়ার উন্নত মান অনুযায়ী হওয়া উচিত। অতএব এই দৃষ্টিকোণ থেকে পরামর্শদাতাদের অনেক বড় দায়িত্ব রয়েছে যেন তারা আত্মবিশ্লেষণ করেন যে, তাদের তাকওয়ার মান কেমন। হযরত আলী (রা.)-এর একটি রেওয়ায়েত তো এতটা স্পষ্ট করে যে, তিনি বলেন, 'শাভেরুল ফুকাহাআ ওয়াল আবেদীন'।

(কুনযুল উম্মাল, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪১১, হাদীস-৭১৯১)

অর্থাৎ বিজ্ঞ ও ইবাদতগুযার লোকদের সাথে পরামর্শ করো; সবার সাথে নয়। অতএব এটি হলো (শূরার) প্রতিনিধিদের মর্যাদা।

এতে তাদের জন্যও শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে যারা শূরার প্রতিনিধি নির্বাচন করে। অর্থাৎ (তারা) যেন নিজেদের মধ্য থেকে এমন লোকদের নির্বাচন করে যারা বাহ্যত সুপরামর্শদাতা, ধর্মীয় জ্ঞানে উত্তম এবং তাদের ইবাদতের মানও উন্নত।

যেখানেই এই মানকে দৃষ্টিপটে রেখে প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয় সেসব প্রতিনিধির মতামতে আমি দেখেছি যে, এক স্পষ্ট পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয়। আর এটি সেসব প্রতিনিধির দায়িত্ব যে, জামা'তের সদস্যরা যদি সুধারণা রেখে কাউকে শূরার প্রতিনিধি নির্বাচন করে থাকে তাহলে তারা যেন উক্ত সুধারণার মান রক্ষা করে। একদিনে বা কয়েক সপ্তাহে কেউ জ্ঞানের উন্নত মান এবং ধর্মের গভীর জ্ঞান লাভ করতে পারে না, কিন্তু তাকওয়ার পথে থেকে সকল প্রকার স্বার্থের উর্ধ্বে গিয়ে যে কেউ পরামর্শ দিতে পারে। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'লার সামনে বিনত হয়ে, তাঁর কাছে সাহায্য যাচনা করে, দোয়ার সাথে যেসব স্থানে শূরা অনুষ্ঠিত হচ্ছে সেখানকার প্রতিনিধিদের উচিত নিজেদের পরামর্শ দেয়া; কোনো বক্তার বক্তৃতায় প্রভাবিত হয়ে নয় এবং কোনো সম্পর্ক বা বন্ধুত্বের কারণে অন্যের সুরে সুর মেলানো উচিত নয়। আর কোনো ভীতি অথবা চক্ষুলজ্জার কারণেও নিজের মত পরিবর্তন করা উচিত নয়। বরং তাকওয়াকে দৃষ্টিপটে রেখে জামা'তের স্বার্থকে সকল বিষয়ের ওপর প্রাধান্য দিয়ে যখন পরামর্শ প্রদান করবেন, তখনই প্রকৃত অর্থে তারা নিজেদের প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন করতে পারবেন।

সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের হৃদয়ের অবস্থা জানেন, আর আমাদের সকল কর্মকাণ্ডও তিনি দেখছেন। আমি যদি তাঁর সন্তুষ্টিকে দৃষ্টিপটে রেখে কাজ না করি পাছে না আমি আল্লাহ্ তা'লার অসন্তুষ্টির পাত্র হয়ে যাই। একইভাবে যেখানে শূরা হয়ে গেছে সেখানে শূরার সদস্যরা এখন নিজেদের দায়িত্ব এভাবে পালন করুন, নিজ ব্যবহারিক দৃষ্টান্তের প্রতি, নিজ আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিক অবস্থার প্রতি সর্বদা দৃষ্টি রেখে জীবন যাপন করার অঙ্গীকার করুন এবং যেসব সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে বা হয়েছে, তাকওয়ার পথে ধাবমান হয়ে সেগুলো বাস্তবায়ন করার এবং করানোর চেষ্টা করুন।

আমরা যদি এমন অবস্থা তৈরি করতে সক্ষম হই কেবল তবেই আমরা আল্লাহ্ তা'লার কৃপারাজীকে আকর্ষণকারীও হবো আর আমাদের সিদ্ধান্ত আশিসময় হবে। অন্যথায় আমাদের এক স্থানে একত্র হওয়া এবং নিজ নিজ মতের পক্ষে জোরালো বক্তৃতা করা সেই জাগতিক সংসদগুলোর মতোই হবে যেখানে তাকওয়া নেই, আর সেখানে এমন এমন সিদ্ধান্ত হয় যাবেশিরভাগ ক্ষেত্রে নৈতিক চরিত্রকেও বিনষ্ট করে দেয় আর তা আল্লাহ্ তা'লার শিক্ষারও পরিপন্থী হয়ে থাকে। সেখানে নিজ দলের স্বার্থ কে সামনে রাখা হয়। কখনো কখনো এসব ভুল সিদ্ধান্তের মন্দ পরিণাম খুবই দ্রুত প্রকাশ পেয়ে যায় যা শান্তি ও সৌহার্দ্য বিনষ্ট করে দেয় এবং কোনো কোনো সময় অনেক বিলম্বেও মন্দ পরিণাম প্রকাশিত হয়। কিন্তু সেগুলোতে কোনো বরকতই থাকে না। যাহোক, যেসব সিদ্ধান্ত আল্লাহ্ তা'লার বিধান ও শিক্ষামালার পরিপন্থী হয় সেগুলো অবশেষে জাতির ধ্বংসের কারণ হয়।

সুতরাং জগতপূজারীদের অবস্থা দেখেও আমাদেরকে নিজেদের অবস্থার উন্নয়নের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত।

আমি যেমনটি বলেছি, শূরার সদস্যদের প্রস্তাবনা যুগ-ইমামের কাছে উপস্থাপন করা হয় এবং যুগ-খলীফার নির্দেশেই এ শূরা আহ্বান করা হয়। কাজেই সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত, মজলিসে শূরা খিলাফতের একটি সহায়ক প্রতিষ্ঠান, আর এ দৃষ্টিকোণ থেকে জামা'তের মাঝে খিলাফতের পর এর গুরুত্ব অত্যধিক এবং শূরার জন্য মনোনীত প্রত্যেক সদস্য এক বছরের জন্য সদস্য হয়ে থাকে। এই গুরুত্বকে তার সর্বদা দৃষ্টিপটে রাখা উচিত। শূরার এজেন্ডাসমূহ ও পরামর্শের মাধ্যমেই যুগ-খলীফা বিভিন্ন দেশে বিদ্যমান সমস্যাদি সম্পর্কে অবগত হন। এরপর যেসব পরামর্শ ও মতামত আসে এর মাধ্যমে সেসব সমস্যা সমাধানের উপায় বা পদ্ধতিও সামনে আসে। অনেক সময় কোনো সমস্যা সমাধানকল্পে কোনো কোনো কথা বা বিষয় সবিস্তারে আলোচিত হয় না বা শূরার সদস্যদের সামনেই আসে না, কিন্তু খলীফাগণ সেসব বিষয়কেও কর্মপন্থায় অন্তর্ভুক্ত করে নেন। কোনো কোনো জায়গায় আমিও এ রীতি অবলম্বন করে থাকি। যাহোক, শূরার এক বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে– শূরার প্রত্যেক সদস্যের এ বিষয়টি অনুধাবন করা উচিত। এই গুরুত্ব কেবল তিন দিনের মাঝে সীমাবদ্ধ নয় বরং এটি পুরো বছরের জন্য। যে কর্মপন্থাই নির্ধারিত হয় সেটি বাস্তবায়ন করানোর ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনাকে শূরার প্রত্যেক সদস্যের পূর্ণ সহযোগিতা করা উচিত; এটি তার দায়িত্ব। এমনটি হলে জামা'তের উন্নতির বিভিন্ন পরিকল্পনা সঠিক পথে পরিচালিত হবে আর এসব পরিকল্পনা উত্তমরূপে বাস্তবায়ন হবে। সত্য-সঠিক পথ ও হেদায়েতের প্রসারের যে দায়িত্ব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর স্কন্ধে ন্যস্ত হয়েছে আমরা তাতে সহযোগী ও সাহায্যকারী হতে পারবো। এমনটি না হলে শূরার সদস্য হওয়া নিরর্থক।

এখানে আরেকটি বিষয়ও উল্লেখ করতে চাই। বিশ্বের প্রত্যেক দেশে শূরা সাধারণত সেদেশের আমীরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে আর কখনো কখনো মতামত ব্যক্তকারীরা বক্তৃতা করতে গিয়ে আবেগের বশবর্তী হয়ে এমন শব্দ ব্যবহার করে বসে যা শূরার পবিত্রতার পরিপন্থী। এক্ষেত্রে প্রথম কথা হলো, সদস্যগণ যখনই নিজ নিজ মতামত উপস্থাপন করবেন তখন বক্তৃতায় আবেগতাড়িত হওয়ার পরিবর্তে , বিবেক-বুদ্ধি বিবর্জিত আবেগী বক্তৃতা না করে উপযুক্ত বাক্য ব্যবহার করে নিজের মতামত উপস্থাপন করুন। অনেক সময় পরামর্শদাতা এমন কথা বলে ফেলেন যাতে আমেলার সদস্যবৃন্দ বা জামা'তের আমীর যার সভাপতিত্বে শূরা পরিচালিত হচ্ছে মনে করেন, পরামর্শদাতা পরোক্ষভাবে বা প্রত্যক্ষভাবে অর্থাৎ সরাসরি আমাদের বিরুদ্ধে কথা বলছে; ফলে সভার সভাপতি হওয়ার সুবাদে বক্তাকে কঠোর ভাষায় থামিয়ে দেওয়া হয়, বকাঝকা করা হয়। আমীরদেরও ধৈর্য প্রদর্শন করা উচিত। এই সুধারণা রাখা উচিত যে, বক্তা যা বলছে তা জামা'তের স্বার্থে এবং জামা'তের জন্য হৃদয়ের বেদনা থেকে বলছে।

যদি কঠোর বাক্য ব্যবহার করে থাকে বা এমন শব্দ ব্যবহার করে যা শূরার পবিত্রতারপরিপন্থী তাহলে নম্রভাবে তাকে বাধা দিন। এমন আচরণ প্রদর্শন করবেন না যা থেকে সন্দেহের সৃষ্টি হতে পারে যে, শূরার সভাপতি বিষয়টিকে আমিত্বের প্রশ্ন বানিয়ে নিয়েছে।

বিশেষভাবে যখন বাজেটের বিষয়ে আলোচনা হয় তখন আবেগের বহিঃপ্রকাশ বেশি হয় আর কোনো কোনো ক্ষেত্রে মতভিন্নতা প্রকাশ পায়। এহেন পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট সেক্রেটারী, সেক্রেটারী মাল এবং সভার সভাপতির উচিত ধৈর্যের সাথে কথা শুনে তার উত্তর প্রদান করা। তাকে আশ্বস্ত করা উচিত যে, কীভাবে বাজেট তৈরি হয়েছে, কীভাবে আয় হবে আর কীভাবে ব্যয় হবে আর আয়ব্যয়ের যৌক্তিক ব্যাখ্যা কী ইত্যাদি। যে কথা বলে সে তো জামা'তের স্বার্থকে দৃষ্টিপটে রেখে কথা বলে, তাই কোনো কুধারণা করা উচিত নয়। তেমনিভাবে এজেন্ডার অন্যান্য প্রস্তাবনাসমূহে কখনো কখনো অযথাই ব্যবস্থাপনার সদস্যরা আর প্রতিনিধিরাও তর্কে জড়িয়ে পড়ে বা একেবারেই নিশ্চুপ হয়ে যায় যেন তাদের মাঝে ব্যবস্থাপনার ভীতি বিরাজমান। এমন লোকেরাও নিজেদের আমানত যথাযথভাবে প্রত্যার্পণ করছেন না।

অতএব সর্বদা স্মরণ রাখবেন, প্রতিনিধিবর্গকে জামা'তের সদস্যরা নির্বাচিত করেছেন যথাবিহিত প্রতিনিধিত্ব করার জন্য আর আমানতের ক্ষেত্রে সঠিক দায়িত্ব পালনের জন্য। তাই কোনো আমিত্বের প্রশ্নও ওঠা উচিত নয় কিংবা কোনোরূপ ভীতিও যেন না থাকে। সর্বদা স্মরণ রাখবেন যে , মানুষ আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার এই নির্দেশের ভিত্তিতে নির্বাচিত করেছেন যে, إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا অর্থাৎ আমানতসমূহ এর যোগ্য পাত্রে অর্পণ কর আর যুগ-খলীফাও এটি মনে করেন যে, মানুষ যখন সদিচ্ছার বশবর্তী হয়ে আল্লাহ্ তা'লার এই নির্দেশ অনুযায়ী নিজেদের প্র তিনিধি মনোনীত করেছে তাই প্রতিনিধিরাও এ নির্দেশ অনুযায়ী আমানতের যথাযথ প্রত্যার্পণ করে থাকবেন। আর প্রতিনিধিরা যদি তাদের কর্তব্য শূরা চলাকালীন ও শূরা পরবর্তী সময়ে পালন না করেন তাহলে তারা কেবল জামা'তের সদস্যদের বিশ্বাসকেই পদদলিত করছে না, বরং আমানত সঠিক স্থানে ন্যস্ত না করে যুগ-খলীফার প্রতিও খিয়ানত করছেন। কিন্তু এখানে আরেকটি দিকও থাকতে পারে। হতে পারে

কোনো কোনো ক্ষেত্রে নির্বাচনকারীরাও তাকওয়ার ভিত্তিতে প্রতিনিধি নির্বাচন করে নি। আত্মীয়তার কারণে বা বন্ধুত্বের দাবির নিরিখে নির্বাচন করে থাকবেন।

যাইহোক, যারা এভাবে নির্বাচন করেছে তারা নিঃসন্দেহে পাপ করেছে; এটি অপকর্ম ছিল যা তারা করেছে। তারা যদি সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন না করে তাহলে তাদের ইস্তেগফার করা উচিত। কিন্তু প্রতিনিধিবর্গ এবং কর্ম কর্তাগণ একবার যেহেতু নির্বাচিত হয়ে গেছেন আর ব্যবহারিক ও আধ্যাত্মিকতার সেই মানে তারা নেই যে মানে তাদের থাকা উচিত,সেক্ষেত্রে এখন ইস্তেগফার করে নিজেদের অবস্থায় ইতিবাচক পরিবর্তন সাধনের অঙ্গী কার করে এবং তাকওয়ার পথে চলার সর্বাত্মক চেষ্টা করে নিজেকে আমানত আদায়ের যোগ্য করে তোলার চেষ্টা করাউচিত। এমন চেষ্টা করলে একদিকে যেখানে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন করবেন সেখানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মিশন বাস্তবায়নেও সহায়ক হবেন। আর নিজেদের ব্যবহারিক ও আধ্যাত্মিক মানও উন্নত করবেন।

আমি যেমনটি বলেছি, প্রতিনিধিত্বের মেয়াদকাল এক বছর হয়ে থাকে আর এসময়ের মধ্যে ব্যবস্থাপনার সাথে সহযোগিতাও করতে হবে, সিদ্ধান্ত নিজেও মেনে চলতে হবে আর অন্যদেরকেও মানাতে হবে। এ বিষয়টি অর্জনের জন্য সর্বদা তদারকি করতে থাকুন, আপনার জামা'তেকি এ বিষয়ে কাজ হচ্ছে নাকি হচ্ছে না, বা হলে কতটা হচ্ছে? আর যুগ-খলীফা যেভাবে সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন সেভাবে হচ্ছে কি?

অতএব, এভাবে আপনাকে যুগ-খলীফার সাহায্যকারী হতে হবে। অনেক সময় দেখা যায়, সিদ্ধান্তসমূহ বিভিন্ন জামা'তে গিয়ে কর্মকর্তাদের অলসতার শিকারে পরিণত হয়। যখন কোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তা বাস্তবায়ন হয় না। অতএব এমন অবস্থায় শুধু জামা'তের সাধারণ সদস্যদেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রতিনিধিদের দায়িত্ব নয়, বরং যারা কর্মকর্তা তাদেরকেও তাদের দায়িত্ব কর্তব্যের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করতে হবে। কিন্তু এরপরও যদি মনোযোগ সৃষ্টি না হয় আর এই প্রস্তাব যেভাবে বাস্তবায়িত হওয়া উচিত ছিল সেভাবে যদি না হয় তাহলে মার্কাযে পত্র লিখুন। অনুরূপভাবে অনেক কর্মকর্তাও শূরার সদস্য হয়ে থাকেন। তাদের নিজ নিজ বিভাগের কাজ দেখাই তাদের একমাত্র দায়িত্ব নয়, বরং শূরার বিভিন্ন প্রস্তাব এবং সেগুলো সম্পর্কে যুগ-খলীফার সিদ্ধান্ত না মানা এবং বাস্তবায়ন না হওয়ার বিষয়টিও তাদের গুরুত্ব সহকারে দেখা উচিত, তা তার নিজের দপ্তর সংক্রান্ত হোক বা অন্যের। এছাড়া সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং আমীরের (এদিকে) দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত এবং আমেলা তথা কার্যকরী পরিষদেও এ বিষয়টি রাখা উচিত, অন্যথায় এমন কর্মকর্তা এবং প্রতিনিধিরাও তাদের আমানতের দাবি পূরণ করছেন না। এ পৃথিবীতে হয়ত তারা কোনো অজুহাত দেখিয়ে পার পেয়ে যাবেন, কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ্ তা'লার নিকট কোনো বিষয়ই গোপন নেই আর তিনি আমানত রক্ষা করার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করবেন। অতএব এটি অনেক চিন্তার বিষয়। আমরা শূরার প্রতিনিধি বা কর্মকর্তা- এসব বলে আমাদের গর্ব করা উচিত নয় বরং প্রত্যেকেরই নিজ দায়িত্ব নিয়ে চিন্তা করা উচিত।

যেভাবে আমি বলেছি, জামা'তগুলোর কর্মকর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সত্ত্বেও যদি শূরায় গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়িত না হয়ে থাকে, প্রতিনিধিরা যদি চেষ্টা করে আর তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করার পরও যদি তারা তা আমলে না নেয়- তাহলে মার্কাযকে অবগত করুন। এখনো কিছু লোক এমনটি করে থাকে; এমন নয় যে, আদৌ করছে না। কেউ কেউ এ অনুসারে কাজ করে, অর্থাৎ পদাধিকারীরা যদি (শূরার সিদ্ধান্ত) বাস্তবায়ন না করে তাহলে তারা মার্কাযকে অবগত করে। কিন্তু সাধারণত তা তখন করে যখন ব্যক্তিগত আক্রোশের কারণে কোনো কর্মকর্তার সঙ্গে তাদের মতবিরোধ দেখা দেয়। এ পথটি তাকওয়ার পথ নয়। প্রত্যেক প্রতিনিধি ও প্রত্যেক কর্মকর্তা যদি তাকওয়ার ভিত্তিতে শূরার অনুমোদিত প্রস্তাবগুলো বাস্তবায়ন করা ও করানোর চেষ্টা করে তাহলে আর কখনো এমন অবস্থার সৃষ্টি হবে না যে, একই প্রস্তাব পরের বছর বা দুই-তিন বছর পর পুনরায় শূরায় উপস্থাপনের জন্য আসবে।

পুনরায় প্রস্তাব আসার অর্থই হলো- হয় এটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পুরোদমে কাজ করা হয় নি, অথবা যেভাবে হওয়া উচিত ছিল সেভাবে হয় নি।

কাজেই এ ধরনের জামা'ত এবং কর্মকর্তাদেরও চিন্তা করে দেখা উচিত, এটি কি তাকওয়ার পথে চলার এবং নিজেদের আমানতের দাবি পূর্ণ করার কাজ? এটি কি খিলাফতের প্রতি আনুগত্য এবং বিশ্বস্ততা প্রদর্শনের অঙ্গীকার বাস্তবায়নের চিত্র? দেশের ভেতরে যেসব জামা'ত রয়েছে তারা তাদের দেশীয় কেন্দ্রকে এমন সব প্রস্তাব তখনই প্রেরণ করে যখন তারা দেখে এসব বিষয়ে কাজ করা হচ্ছে না।

যুগ ইমামের বাণী

ইসলামের সুরক্ষা এবং সত্যের উদ্ঘাটনের জন্য সর্বপ্রথম তোমরা প্রকৃত মুসলমানের নমুনা হয়ে দেখাও।

(মালফুযাত , ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬১৫)

দোয়াপ্রার্থী: Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

যদি হয়ে থাকে এবং প্রত্যেক জামা'তের প্রতিটি স্তরে নজরদারি হতে থাকে যে, (সিদ্ধান্তগুলো) কতটা বাস্তবায়িত হচ্ছে- তাহলে এসব পরামর্শ পুনরায় আসতই না। এছাড়া দেশীয় কেন্দ্রের যুগ-খলীফার সমীপে এসব পরামর্শকে এই সুপারিশসহ পাঠানোর প্রয়োজন পড়ত না যে, এ প্রস্তাবটি যেহেতু এক বা দু'বছর পূর্বে (শূরায়) উত্থাপিত হয়েছিল তাই (এবারের) শূরায় এটি উত্থাপনের জন্য সুপারিশ করা হচ্ছে না। এই উত্তর লেখার সময় দেশের কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনাকে লজ্জিত হয়ে লেখা উচিত যে, আমরা এটি বাস্তবায়ন করাতে পারি নি বলে লজ্জিত। এখন এ বছর আমরা এটি বাস্তবায়ন করবো। কিন্তু আমরা যদি বাস্তবায়ন করাতে ব্যর্থ হই তাহলে আমরা অপরাধী সাব্যস্ত হবো এবং যারা তাদের আমানতের দাবি পূরণ করছে না তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবো।তাদের এভাবে লিখিত দেয়া উচিত। এরপর লিখুন, এজন্য আমরা অত্যন্ত বিনয়ের সাথে ক্ষমা প্রার্থনা করে এ বছর এ প্রস্তাবটি উপস্থাপন না করার সুপারিশ করছি। এরূপ করলেই দায়িত্ব পালনের বিষয়ে উপলব্ধি হবে। এর ফলে ব্যবস্থাপনা ও প্রতিনিধিদের মাঝেও অন্তত এতটুকু উপলব্ধি সৃষ্টি হবে যে, তারা এমন বড় বড় কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করে যুগ-খলীফার সমীপে উপস্থাপন কে র যে, আমরা হেন করবো তেন করবো কিন্তু পরে সেটি বাস্তবায়নে কাজই করে না, তাই তারা অপরাধী এবং যুগ-খলীফার আস্থাকে পদদলিত করে। অতএব এ দৃষ্টিকোণ থেকে যেমন সম্মিলিত আত্মজিজ্ঞাসা করতে হবে তেমনি ব্যক্তিগতভাবেও কর্মকর্তাদের এবং শূরার প্রতিনিধিদের আত্মবিশ্লেষণ ও এস্তেগফার করা উচিত, আর এরপর এটি বাস্তবায়ন না করার কারণগুলি প্রত্যেক স্তরে জানার চেষ্টা করুন। অতএব এরূপ বিশ্লেষণই জামা'তের ব্যবস্থাপনাকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারে। অন্যথায় মুখের কথায় কোনো লাভ হয় না। দেশীয় পর্যায়ে খতিয়ে দেখার প্রয়োজন রয়েছে যে, কোনো কোনো সক্রিয় জামা'ত শূরার প্রস্তাবনা শতভাগ না হলেও সত্তর বা আশিভাগ বাস্তবায়ন করে এবং একাগ্রচিত্তে করে। কেননা (তারা ভাবে) যুগ-খলীফার অনুমোদন সাপেক্ষে আমরা এই কর্মপরিকল্পনা পেয়েছি আর যুগ-খলীফার আস্থার আমরা অবমূল্যায়ন করব না। তাই দেখা উচিত যে, কী সেই প্রেরণা যার কল্যাণে এই জামা'তের সদস্যদের মধ্যে এই বিপ্লব সাধিত হয়েছে? এমন সক্রিয় জামা'তগুলোর কর্মকর্তাদের সাথে দুর্বল জামা'তগুলোর কর্মকর্তাদের বৈঠক করানো উচিত, বরং কেন্দ্রীয় কর্মকর্তাদের সঙ্গেও বৈঠক করানো উচিত এবংতাদের অভিজ্ঞতা থেকে লাভবান হওয়ার চেষ্টা করা উচিত।

কোনো জায়গায় যদি একটি জামা'তও সক্রিয় এবং নিজেদের ব্যবহারিক ও আধ্যাত্মিক কর্মসূচীতে সক্রিয় হয়ে থাকে তাহলে অন্য দশটি জামা'তকে তাদের কর্মের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে উপকৃত করতে পারে। কিন্তু মূল বিষয় হলো, কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনায় যদি প্রত্যেক সেক্রেটারি এবং পদাধিকারী ও শূরার প্রতিনিধিরা নিজেদের ভূমিকা বিশ্বস্ত তার সাথে পালন করে তাহলেই এটি সম্ভব।

কিছু জামা'ত বা দেশ এই পর্যালোচনাও করেছে আর এর সুফল পেয়েছে যে, বিগত তিন বছরে শূরার সিদ্ধান্ত কতটুকু বাস্তবায়িত হয়েছে এবং হচ্ছে? তারা এর ত্রৈমাসিক পর্যালোচনামূলক প্রতিবেদন কেন্দ্রে পাঠিয়ে থাকে। এ থেকে (বুঝা যায়), তাদের মাঝে এই দায়িত্ববোধ রয়েছে যে, এ প্রস্তাবটি দুই বছর পূর্বে উপস্থাপিত হয়েছিল এজন্য এখন আর এটি উপস্থাপিত হবে না- একথা বলে আমরা বসে থাকবো না; বরং এই রিপোর্ট কেন্দ্রে পাঠাতে হবে যে, এই কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আমরা আমাদের এতটুকু লক্ষ্য অর্জন করেছি এবং আরো চেষ্টা করা হচ্ছে। এতে এ ধরনের জামা'তগুলোর দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি পেয়েছে। শুধু কথার ফুলঝুরিতে আমরা বিশ্বজয় করতে পারবো না, বরং এর জন্য রয়েছে কর্মের প্রয়োজন।

যেখানে বস্তুনিষ্ঠ পরিকল্পনার প্রয়োজন রয়েছে সেখানে ব্যবহারিক প্রচেষ্টাও অব্যাহত রাখতে হবে, ইবাদতসমূহের ক্ষেত্রে উচ্চমানে উপনীত হতে হবে। কর্মকর্তা ও শূরার প্রতিনিধিরা যদি নিজেদের ইবাদতের মান উন্নত করার প্রতি মনোনিবেশ করেন এবং মসজিদগুলি আবাদ বা (নামাযীতে) পরিপূর্ণ করার বিষয়ে ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন তাহলে মসজিদের নামাযীর সংখ্যাও তিন থেকে চার গুণ বৃদ্ধি পাওয়া সম্ভব। এ ক্ষেত্রেও আমাদের পর্যালোচনা করা উচিত।

অতএব নিজেদের ব্যবহারিক আচরণ (উপস্থাপন), মানুষের সাথে ভালোবাসা ও আন্তরিকাতপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা, তাদের জন্য হৃদয়ে মমতা রাখা এবং তাদের ও নিজেদের জন্য দোয়া করা আর যুগ-খলীফার আনুগত্যের মান সুউচ্চ করা যখন প্রত্যেক কর্মকর্তা ও শূরার সদস্যের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হবে কেবল তখনই জামা'তের মাঝে আমরা সামগ্রিকভাবে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন লক্ষ্য করব।

আমাদের ওপর গুরুদায়িত্ব অর্পিত রয়েছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আবির্ভাবের উদ্দেশ্য এবং তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন কোনো সামান্য কাজ নয়। ইসলামের অনিন্দ্য-সুন্দর বাণী বিশ্ববাসীর দোরগোড়ায় পৌঁছে জগদ্বাসীকে এক-অদ্বিতীয় খোদার উপাসক বানানো নিরন্তর প্র চেষ্টার দাবি রাখে।

(শেষাংশ শেষের পাতায়.....)

সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) বিভিন্ন সময়ে নিজের চিঠিতে এবং এম.টি.এর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যে দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছেন, সেগুলি থেকে পাঠকদের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

(বিগত সংখ্যার পর) অপর এক স্থানে তিনি বলেন, 'সকল নবীগণের কিতাব এবং অনুরূপভাবে কুরআন শরীফ থেকেও জানা যায় যে, খোদা তা'লা আদম থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত সভ্যতার আয়ু সাত হাজার বছর ধার্য করেছেন। এবং হিদায়াত ও পথভ্রষ্টতার জন্য জন্য দুই হাজার বছর ধার্য করেছেন। অর্থাৎ একটি যুগে হিদায়তের আধিপত্য থাকবে এবং অপরটিতে পথভ্রষ্টতার আধিপত্য থাকবে। আর যেমনটি আমি বর্ণনা করেছি, খোদা তা'লার কিতাবে এই দুটি যুগই হাজার হাজার বছরে বিভক্ত করা হয়েছে। ..... অতঃপর পঞ্চম সহস্রের যুগ এল যেটি ছিল হিদায়াতের যুগ। এই যুগেই আমাদের নবী (সা.) আবির্ভুত হয়েছিলেন। এবং খোদা তা'লা আঁ হযরত (সা.)-এর হাতে তৌহিদকে পৃথিবীর বুকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। সুতরাং, তাঁর খোদার পক্ষ থেকে হওয়ার এটিই একটি শক্তিশালী প্রমাণ যে, তাঁর আবির্ভাব সেই সময়ের মধ্যে হয়েছে যা আদি থেকেই হিদায়তের জন্য নির্ধারিত ছিল আর একথা আমি নিজের পক্ষ থেকে বানিয়ে বলছি না, বরং খোদা তা'লার সমস্ত কিতাব থেকে এই নির্যাস পাওয়া যায়। আর এই দলিল থেকে আমার প্রতিশ্রুত মসীহ হওয়ার দাবি প্রমাণ হয়। কেননা এই বন্টনের নিরিখে ষষ্ঠ সহস্রকালটি ছিল পথভ্রষ্টতার যুগ। আর এটি হিজরতের তৃতীয় শতাব্দীর পর আরম্ভ হয়। আর চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে এসে শেষ হয়। আঁ হযরত (সা.) এই ষষ্ঠ সহস্রের মানুষদের নাম রেখেছেন 'ফেইজে অউজ' এবং সপ্তম সহস্রটি হল হিদায়াতের যার মধ্যে আমরা রয়েছি। যেহেতু এটি শেষ সহস্র, তাই শেষ যুগের ইমামের জন্য এই সহস্রের শিরোভাগে আবির্ভুত হওয়া আবশ্যক ছিল। আর তাঁর পর আর কোনও ইমাম নেই, আর না আছে কোন মসীহ। কিন্তু একমাত্র সেই ব্যক্তি, যে-তার জন্য বুরুজ বা প্রতিচ্ছবি হবে। কেননা, এই সহস্রের মধ্যেই এখন বর্তমান সভ্যতার পরিসমাপ্তি ঘটবে, যার সাক্ষ্য সকল নবীগণ দিয়ে গেছেন। আর যে ইমাম খোদা তা'লার পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুত মসীহ নামে অভিহিত তিনি এই যুগেরও মুজাদ্দিদ আর শেষ সহস্রেরও মুজাদ্দিদ। এটি যে সপ্তম সহস্র, তা নিয়ে খৃষ্টান ও ইহুদীদের মধ্যেও কোনও মতবিরোধ নেই। আর খোদা তা'লা সূরা আল আসর এর সংখ্যা মান অনুসারে আদমের বয়স আমার প্রকাশ করেছেন, এর থেকেও প্রমাণ হয় যে আমাদের বর্তমান যুগটি সপ্তম সহস্র। আর সকল নবীগণ এ বিষয়ে ঐক্যমত ছিলেন যে, প্রতিশ্রুত মসীহ সপ্তম সহস্রের শিরোভাগে আবির্ভুত হবে।

এবং ষষ্ঠ সহস্রের প্রান্তভাগে জন্মগ্রহণ করবে। কেননা, সে সব থেকে শেষে আসবে, যেরূপে আদম সর্বপ্রথম ছিলেন।

(লেকচার সিয়ালকোট, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২০, পৃ: ২০৭-২০৮)

অতএব এটিই সেই শেষ যুগ যখন খোদা তা'লা আঁ হযরত (সা.)এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে তাঁর আধ্যাত্মিক পুত্র ও নিষ্ঠাবান দাস হযরত মসীহ ও মাহদীকে খাতামুল খোলাফা রূপে ইসলাম ধর্মের সংস্কারের জন্য আবির্ভুত করেছেন।

৪) এরপর রয়েছে শপথ নেওয়া বা কসম খাওয়ার বিষয়টি। প্রথমত অকারণে কসম খাওয়া উচিত নয়। আর যদি প্রয়োজন পড়ে আর শপথ গ্রহণকারী সত্যের উপর থাকে তবে সে খোদা তা'লার নামে শপথ করতে পারে। একজন মানুষের জন্য অপরের নামে শপথ করা বৈধ ন। হযরত আবু হুরাইরা (রা.) এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে-

لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمْ وَلَا بِالْأَنْدَادِ وَلَا تَحْلِفُوا إِلَّا بِاللهِ وَلَا تَحْلِفُوا بِاللهِ إِلَّا وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ

অর্থাৎ নিজেদের পিতামাতা এবং প্রতিমাদের নামে কসম খেয়ো না। বরং আল্লাহ্‌র ব্যতিরেকে অন্য কারো নামে কসম খেয়ো না। আর আল্লাহ্‌র কসম কেবল সেই সময় খাও যখন তোমরা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক।

প্রশ্ন: পাকিস্তানের এক আহমদী হুযুর আনোয়ারের কাছে জানতে চেয়েছেন যে, ফজরের আযান এবং ইকামতের মাঝে কতটুকু সময় থাকে? সহীহ বুখারীর একটি হাদীস থেকে জানা যায় যে, সূরা বাকারা তিলাওয়াত করতে যতটুকু সময় লাগে, আযান ও ইকামতের মাঝে ততটুকু সময় হওয়া বাঞ্ছনীয়।

হুযুর আনোয়ার (আই.) ২০২১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে এই প্রশ্নের উত্তরে লেখেন-

সহীহ বুখারীর এমন কোন হাদীস তো অন্তত আমার জানা নেই যেখানে একথার উল্লেখ রয়েছে যে, ফজরের নামাযের আজান ও ইকমতের মাঝে এতটুকু সময় থাকা উচিত যতটুকু সময় সূরা বাকার তিলাওয়াত করতে ব্যয় হয়। আপনি বুখারীর যে হাদীসের উল্লেখ করেছেন, সবার আগে আপনি আমাকে সেই হাদীসটি পাঠান। এরপর আমি কোন কিছু বলতে পারব।

এছাড়া আমরা এখানে মসজিদে মুবারকে ফজরের আগের সময় (ফজরের আযান) থেকে নামায পর্যন্ত বিভিন্ন ঋতু সাপেক্ষে বিভিন্ন সময় ২৫ থেকে ৪০ মিনিট পর্যন্ত সময় রাখি। আর ফজরের আযানের সময় হয়ে থাকে সাধারণত সূর্যোদয়ের ১ ঘন্টা ২০ মিনিট থেকে ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত। আর সারা পৃথিবীর ক্রান্তীয় অঞ্চলে সাধারণতএই নিয়মিত প্রচলিত।

বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের উন্নতি এবং নিত্যনতুন আবিষ্কারের কারণে ফজর, সূর্যাস্ত এবং সুর্যোদয়ের নিখুঁত সময় জানা যায় যা অতীতে সম্ভব হত না।

ইসলাম নামাযের জন্য শুধু একটি নির্দিষ্ট সময়ের অনিবার্য কোনও নীতি বেঁধে দেয় নি, বরং মুসলমানদের সুবিধার জ ন্য সমস্ত নামাযের জন্য একটি সময়কাল নির্ধারণ করেছে। যেমন অমুক সময় থেকে অমুক সময় পর্যন্ত অমুক নামায পড়া যেতে পারে। যাতে মানুষ নিজেদের সুবিধা মত সেই সময়ের মধ্যে বা-জামাত নামাযের সময় নির্ধারণ করতে পারে।

হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.) এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, প্রত্যেক নামাযের একটা শুরুর সময় এবং একটা শেষের সময় থাকে। যোহরের নামাযের প্রথম সময় হল সূর্যের হেলে যাওয়া এবং শেষ সময় হল আসরের সময় শুরু হয়ে যাওয়া। আসরের প্রথম সময় হল এর প্রথম ভাগ এবং শেষ সময় হল সূর্য হরিদ্রাভ বর্ণ ধারণ করা পর্যন্ত। মগরিবের সময় শুরু হয় সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে আর শেষ সময় হল সন্ধ্যার আলো হারিয়ে যাওয়া পর্যন্ত। আর এশার প্রথম সময় হল গভীর সন্ধ্যা নেমে আসা এবং শেষ সময় হল মাঝরাত্রি পর্যন্ত। ফজরের প্রথম সময় হল ভোরের আলো ফোটার সময় এবং শেষ সময় সূর্যোদয় পর্যন্ত।

(সুনান তিরমিযি, কিতাবুস সালাত)

অনুরূপভাবে সুলেমান বিন বারিদা তাঁর পিতার পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর সমীপে উপস্থিতি হয়ে নামাযের সময় সম্পর্কে জানতে চাইল। হুযুর (সা.) তাকে বললেন, তুমি দু'দিন আমাদের কাছে থাক। অতঃপর তিনি (সা.) হযরত বিলাল (রা.) কে নির্দেশ দিলেন এবং তিনি ফজর উদিত হওয়ার সাথে সাথে তকবীর দিলেন এবং হুযুর (সা.) ফজরের নামায পড়ালেন। এরপর যখন সূর্য হেলে পড়ল, তখন তিনি (সা.) হযরত বিলালকে তকবীর দেওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং তিনি যোহরের নামায পড়ালেন। এরপর তাঁকে সেই সময় আদেশ করলেন যখন সূর্যের শুভ্রতা থাকতে থাকতে তিনি আসরের নামায পড়ালেন। এরপর সূর্যাস্তের পর তাঁকে নির্দেশ দিলেন এবং মগরিবের নামায পড়ালেন। এরপর সন্ধ্যার আলো হারিয়ে জমাট অন্ধকার নামার পর তিনি আদেশ করলেন এবং এশার নামায পড়ালেন। পরের দিন তাঁকে নির্দেশ দিলেন এবং ভোরের আলোতে ফজরের নামায পড়ালেন এবং যোহরের নামায বেলা গড়িয়ে যাওয়ার পর পড়লেন। এরপর তিনি (সা.) আসরের নামায পড়ান যখন কি না সূর্যের শুভ্রতা অবশিষ্ট ছিল। কিন্তু প্রথম দিনের তুলনায় বিলম্বে নামায পড়ালেন। এরপর আঁধার ঘনিয়ে আসার পূর্বে মগরিবের নামায পড়ালেন। এরপর রাতের এক তৃতীয়াংশ অতিক্রান্ত হওয়ার পর তিনি হযরত বিলাল (রা.) কে নির্দেশ দিলেন। তিনি তকবীর দিলেন এবং আঁ হযরত (সা.) এশার নামায পড়ালেন। এরপর যে ব্যক্তি নামাযের সময়ের বিষয়ে জানতে চেয়েছিলেন, আঁ হযরত (সা.) তাঁকে বললেন, তুমি যা কিছু দেখলে, তোমার নামাযের সময় এই সময়গুলির মধ্যে যে কোনও সময়ে হতে পারে।

(সুনান নিসাই, কিতাবু মোয়াকিতুস সালাত)

ফজরের নামাযের সময়ের বিষয়ে সহীহ হাদীস থেকে জানা যায় যে, হুযুর (সা.) সচরাচর ফজর উদিত হওয়ার এতটা সময় ফজরের নামায পড়াতেন যে সময়ের মধ্যে কোন ব্যক্তি পঞ্চাশ-ষাটটি আয়াত পড়তে পারে। এছাড়া হুযুর (সা.) ফজরের নামাযের সাধারণত ষাট থেকে একশটি আয়াত পাঠ করতেন। আর তাঁর নামায শেষ হওয়ার পরও এতটা অন্ধকার থাকত যে, কাছে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষকে চেনা যেত, কিন্তু দূরের মানুষকে চেনা যেত না।

(সহীহ বুখারী, কিতাবু মোয়াকিতুস সলাম)

প্রশ্ন: কানাডা থেকে এক ব্যক্তি প্রশ্ন লিখে পাঠায় যে, শুক্রাণুর মধ্যে Lactobacillus নামক এক প্রকার ব্যাক্টেরিয়া পাওয়া যায় যা আলো অথবা বিদ্যুত উৎপাদনে সক্ষম। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ইসলামী নীতি দর্শন পুস্তকে মানব সৃষ্টির প্রসঙ্গ আলোচনায় যে বিদ্যুত কিম্বা আলোকের কথা উল্লেখ করেছেন, এটাই কি সেই বিদ্যুত বা আলোক?

হুযুর (আই.) এর উত্তরে ২০২১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে লেখা চিঠিতে বলেন-

শুক্রাণুর মধ্যে Lactobacillus নামক ব্যাক্টেরিয়ায় থাকে, আপনার এই কথাটি সঠিক, যেটা Contaminant হিসেবে শুক্রাণুর মধ্যে থাকে। তাদের মধ্যে কিছু কিছু ব্যাক্টেরিয়ার মধ্যে খুব অল্প পরিমাণ বিদ্যুত উৎপাদনের সক্ষমতাও রয়েছে। কিন্তু এই ব্যাক্টেরিয়া তো অন্যান্য আরও অনেক বস্তুর মধ্যে যেমন- দই, ভিটামিন, ভেষজ ইত্যাদির মধ্যেও পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে আমাদের শরীরে আরও অনেক ধরণের ব্যাক্টেরিয়া থাকে যাদের মধ্যে খুব সামান্য হলেও বিদ্যুত উৎপাদনের সক্ষমতা রয়েছে। যেমন- অগ্নাশয়ের মধ্যে থাকা Probiotic microorganism নামক ব্যাক্টেরিয়া যা আমাদের খাদ্য পরিপাকে সহায়তা করে। এছাড়া একথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, এই বিদ্যুত ইলেকট্রনের প্রবাহের কারণে উৎপন্ন হয় যা এক যা এক ভৌতিক বস্তু।

কিন্তু হযরত মসীহ মওউদ (আ.) মানব সৃষ্টির সময় আত্মার আত্মপ্রকাশের কথা যেখানে উল্লেখ করেছেন এবং আল্লাহ্ তা'লার সাথে মানুষের সম্পর্কে উদ্দেশ্য এবং এর দর্শন বর্ণনা করেছেন, বস্তুত সেখানে সেই বৈশিষ্ট্যের কথা বর্ণনা করেছেন যা মানব প্রকৃতির মধ্যে নিহিত রয়েছে। যে সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন-

فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِیْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا

(সূরা রওম: ৩১)

অর্থাৎ আল্লাহ্‌র (সৃষ্ট) প্রকৃতিকে (তুমি অনুসরণ কর) যাহার উপর তিনি মানবকে সৃষ্টি করিয়াছেন। -

আয়াতে এবং

مَا مِنْ مَوْلُوْدٍ اِلَّا یُوْلَدُ عَلَی الْفِطْرَةِ فَاَبَوَاهُ یُهَوِّدَانِهٖ اَوْ یُنَصِّرَانِهٖ اَوْ یُمَجِّسَانِهٖ-

হাদীসে আঁ হযরত (সা.) এর এই মন্তব্য আমাদের পথপ্রদর্শন করেছে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, যেভাবে ছেলের মধ্যে মা-বাবার গঠনগত বৈশিষ্ট্যের কিছুটা অংশ থাকে, অনুরূপভাবে আত্মা যা খোদা তা'লার হাতে সৃষ্ট, স্রষ্টার বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী থেকে প্রচ্ছন্নভাবে কিছুটা অংশ নিজের মধ্যে ধারণ করে। যদিও সৃষ্টি হিসেবে অন্ধকার ও উদাসীনতার প্রাধান্যের কারণে কিছু প্রাণের মধ্যে সেই ঐশী রঙ কিছুটা বিবর্ণ হয়ে পড়ে। কিন্তু একথা অস্বীকার করা যায় না যে, প্রত্যেক আত্মা কিছু না কিছু বৈশিষ্ট্য নিজের মধ্যে ধারণ করে। এছাড়াও কিছু কিছু ব্যক্তির মধ্যে সেই রঙ অপপ্রয়োগের কারণে কদর্য হয়ে দেখা দেয়। কিন্তু এটা সেই রঙের দোষ নয় বরং ব্যবহারের দোষ।

(সুরমা চাশমা আরিয়া, রূহানী খাযায়েন, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৬৮-১৬৯)

আত্মার বাস্তবতা সম্পর্কে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বর্ণনা করে বলেন-

'আত্মা এক সূক্ষ্ম জ্যোতিঃ, যা এই দেহাভ্যন্তরেই জন্মে এবং মাতৃগর্ভে প্রতিপালিত হয়। জন্মবার অর্থ এই যে, প্রথমে গুপ্ত থাকে এবং অনুভূত হয় না। পরে তা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। গোড়া থেকে এর উপাদান বীর্যের মধ্যে বিদ্যমান থাকে। নিঃসন্দেহে তা স্বর্গের খোদার অভিপ্রায়ে, তাঁর অনুমতিতে ও তাঁর ইচ্ছায় এক অজ্ঞাত অবস্থায় রহস্যাবৃতভাবে বীর্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়। এটা বীর্যের এক উজ্জ্বল আলোকময় অবস্থা। আমি বলতে পারি না, এটা বীর্যের সেইরূপ অংশ, যেরূপ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেহের অংশ। কিন্তু এটাও আমি বলতে পারি না যে, এটা বাইরে থেকে আসে বা ভূমিতে পতিত হয়ে বীর্যের মূল ধাতুর সাথে মিশ্রিত হয়। বরং এটা বীর্যে প্রচ্ছন্ন থাকে, যেমন পাথরে আগুন প্রচ্ছন্ন থাকে। খোদার কিতাব এর সমর্থন করে না যে, স্বতন্ত্রভাবে আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয় বা নভোমণ্ডল থেকে পৃথিবীতে নিপতিত হয় এবং দৈবক্রমে বীর্যের সঙ্গে মিলিত হয়ে মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে। বরং এই ধারণা কোন মতেই সত্য বলে গৃহীত হতে পারে না। যদি আমরা এই প্রকার ধারণার বশবর্তী হই, তাহলে প্রাকৃতিক নিয়ম আমাদেরকে ভ্রান্ত বলে সাব্যস্ত করবে।"

(ইসলামী নীতি দর্শন, রূহানী খাযায়েন, ১০ম খণ্ড, পৃ: ৩২২-৩২৩)

আত্মা ও দেহের সম্পর্ক বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

"আত্মা ও দেহের মধ্যে এমন এক নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান যে, এই রহস্য ভেদ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। এই সম্পর্ক সম্বন্ধে, এর চাইতে অধিকতর শক্তিশালী দলিল এই যে, মনোযোগ সহকারে চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, দেহই আত্মার জননী। অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীলোকের গর্ভে আত্মা উপর থেকে নিপতিত হয় না। বরং তা এক আলোকস্বরূপ, যা বীর্যে নিভৃতভাবে গুপ্ত থাকে এবং দৈহিক পুষ্টি সাধনের সঙ্গে সঙ্গে উজ্জ্বলতর হতে থাকে"।

(ইসলামী নীতি দর্শন, রূহানী খাযায়েন, ১০ম খণ্ড, পৃ: ৩২২-৩২৩)

হুযুর (আ.) আরও বলেন, খোদা তা'লা আদমকে সৃষ্টির সাথেই নিজের আত্মা ফুৎকার করে তাঁর প্রকৃতির সঙ্গে নিজের সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। এটা এজন্য করা হয়েছে যাতে সহজাতভাবে মানুষের সঙ্গে খোদার একটা সম্পর্ক সৃষ্টি হয়।

(রিভিউ অফ রিলিজিয়নস, ১ম খণ্ড, নম্বর-৫, মে, ১৯০২, পৃ: ১৭৮)

মানুষের মধ্যে আধ্যাত্মিক ও দৈহিকভাবে আত্মা সঞ্চারিত হওয়ার বিষয়ে হুযুর (আ.) বলেন-

ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ ؕ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِیْنَ-

এর অনুবাদ হল, যখন আমরা এক সৃষ্টিকে প্রস্তুত করে ফেললাম, তারপর আমরা অপর এক সৃষ্টি থেকে মানুষকে সৃষ্টি করলাম। অপর এক শব্দ দ্বারা একথা বোঝাতে চেয়েছেন যে, এটি এমন এক সৃষ্টি যা মানবীয় বুদ্ধি ও বোধগম্যের উর্দ্ধে। অর্থাৎ হৃদয় সৃষ্টির পর দেহের মধ্যে যে আত্মা সঞ্চারিত হয় তা আমরা মানুষের মধ্যে আধ্যাত্মিক ও দৈহিক উভয় দিক থেকে সঞ্চারিত করেছি যা নিতান্ত তুচ্ছ অবস্থায় বিরাজ করে যার বাস্তবতা সম্পর্কে সকল দার্শনিক ও জড়জগতের সমস্ত বিস্মিত।

আল্লাহ্ তা'লা এক স্থানে বলেন, 'আত্মা'-ও আল্লাহ্‌র সৃষ্টি, কিন্তু জগতের বোধগম্যের উর্দ্ধে।

(বারাহীনে আহমদীয়া, ৫ম ভাগ, পরিশিষ্টাংশ, রূহানী খাযায়েন, খন্ড-২১, পৃ: ২১৬-২১৭)

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) আত্মার বাস্তবতা সম্পর্কে বলেন- 'বস্তুত আত্মা হল সেই বস্তু যার মাধ্যমে কেউ এক বিশেষ জীবন লাভ করে। অতএব, সেটিই আত্মা যা পশুদেরকে বাকি জিনিস থেকে পৃথক করছে। এবং সেটাই আত্মা যার সাথে মানুষ অন্যান্য পশুদের থেকে বিশিষ্ট মর্যাদা লাভ করেছে। এই দুইয়ের সঙ্গে আত্মা শব্দটি সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিম্বা আত্মা সেটিকে বলে যা মানুষকে খোদাপ্রেমী মানুষ বানিয়ে দেয়। অতএব, ঐশী বাণীও হল এক প্রকার আত্মা যা মানুষকে নব জীবন দান করে।

(তফসীর কবীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৭২)

এই সকল তত্ত্ব থেকে প্রমাণ হয় যে, মানুষের দৈহিক ও আধ্যাত্মিক সৃষ্টির সময় মানুষের অন্তর সৃষ্টির সময় খোদা তা'লার পক্ষ থেকে প্রকাশি আত্মা সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু। আর বিভিন্ন ব্যাক্টেরিয়ার মধ্যে থাকা বিদ্যুত উৎপাদনের সক্ষমতা সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়।

প্রশ্ন: ঈদুল আযহিয়ার কুরবানী কতদিন পর্যন্ত দেওয়া যেতে পারে?

এই প্রশ্নের বিষয়ে দারুল ইফতা-র পক্ষ থেকে প্রদত্ত এক ফতোয়ার বিষয়ে হুযুর (আই.) ২০২১ সালের ২১ মার্চ তারিখের একটি নির্দেশনায় বলেন-

ঈদুল আযহিয়ার কুরবানী কতদিন পর্যন্ত দেওয়া যেতে পারে- এ সম্পর্কে আপনার ফতোয়া সঠিক। আর এক্ষেত্রে আমারও অবস্থান হল সাধারণ পরিস্থিতিতে কুরবানী তিন দিন পর্যন্ত হতে পারে। কিন্তু যদি কোন বিবশতা থাকে তবে এর পরও কুরবানী করা যেতে পারে।

তবে আপনার সেই যুক্তিটির বিষয়ে আমার আপত্তি ছিল যা আপনি হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) একটি উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করেছিলেন। আমার মতে এই উক্তির মধ্যে হুযুর (রাহে.)ও একথাই বর্ণনা করছেন যে, কুরবানী তিন দিন পর্যন্তই হতে পারে আর হুযুরের এই উক্তিটি ছিল সাধারণ অবস্থার ক্ষেত্রে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) তাঁর উক্ত চিঠিতে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) যে নির্দেশনার কথা উল্লেখ করেছেন তা নিম্নরূপ।

'আঁ হযরত (সা.) এর পন্থা ছিল তিনি ঈদের খুতবা বেশি দীর্ঘায়িত করতেন না। এবং এরপর তিনি কুরবানীর জন্য দ্রুত বাড়ি থেকে বের হয়ে যেতেন। এর মধ্যে এটাও এক প্রজ্ঞা অন্তর্নিহিত ছিল যে, তিনি সেই সময় পর্যন্ত রোযা রাখতেন যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি নিজের কুরবানীর মাংস দিয়ে রোযা না ভাঙতেন। এই সুন্নতটিকে না বোঝার কারণে অনেকে নিয়ম করে ঈদের দিন অবশ্যই রোযা রাখে এবং কুরবানীর কাজ শেষ না করা পর্যন্ত কিছু খায় না। কিন্তু এর অর্থ মোটেই এমন নয় যে কিছু খাওয়া হারাম হয়ে যায়, কিন্তু সুন্নতের মর্মার্থহল, যে - ব্যক্তি কুরবানী করবে, যেদিন কুরবানী করবে, সেই দিনটিতে কুরবানীর মাংস না পাওয়া পর্যন্ত সে রোযা রাখবে। কুরবানী তো তিন দিন পর্যন্ত চলতে থাকে। তাই এর মর্মার্থ যদি সঠিকভাবে অনুধাবন না করা হয় তবে এর অর্থ দাঁড়াবে, অনেকে যারা চতুর্থ দিনে কুরবানী করবে তারা চারদিন পর্যন্ত অভুক্ত থাকবে।"

[খুতবাতে তাহের (ঈদাঈন), পৃ: ৬৫৫, খুতবা ঈদুল আযহিয়া, ২ শে মার্চ, ১৯৯৯]

জরুরী বিজ্ঞপ্তি

কাদিয়ানের নুর হাসপাতালে একজন এক্স-রে টেকনিশিয়ান চায়।

* প্রত্যাশীর বয়স অনুর্দ্ধ ৩৭ বছর হতে হবে। * কোন সরকারি কিম্বা সরকার অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান থেকে এক্স-রে টেকনিশিয়ান এর কোর্স থাকতে হবে এবং যেটি ,,,,,,,, স্বীকৃত। ৩) ডাক্তারের নির্দেশাবলী পড়ার জন্য ইংরেজিতে পারদর্শী হওয়া বাঞ্ছনীয়। ৪) পূর্বের অভিজ্ঞতা থাকা প্রত্যাশীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। ৫) সাপ্তাহিক বদর পত্রিকায় প্রকাশিত শেষ বিজ্ঞপ্তির ২ মাসের মধ্যে যে সব আবেদন পত্র জমা পড়বে সেগুলিই গ্রহণযোগ্য হবে। ৬) জন্ম-তারিখের জন্য স্বীকৃত শংসাপত্রের ফটোকপি দেওয়া আবশ্যক। ৭) ইন্টারভিউ এ উত্তীর্ণ প্রত্যাশীকে নূর হাসপাতালে মেডিক্যাল ফিটনেস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে নিজেকে সুস্থ ও সবল প্রমাণ করতে হবে। ৮)প্রত্যাশীকে কাদিয়ান যাতায়াতের খরচ নিজে বহন করতে হবে। *প্রত্যাশী নির্বাচিত হলে কাদিয়ানে থাকার ব্যবস্থা নিজেকেই করতে হবে। ৯)প্রত্যাশীকে নাযারত দিওয়ানের পক্ষ থেকে দেওয়া নির্দিষ্ট ফর্ম, শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ, সরকারি জন্ম-শংসাপত্র, আধার কার্ড এবং জামাতের আই.এন.ডি কার্ড-এর ফটোকপি অবশ্যই সঙ্গে আনতে হবে। * উপরোক্ত পদের জন্য নাযারত দিওয়ান থেকে ফর্ম সংগ্রহ করুন।

ইচ্ছুক ব্যক্তিরা নিজেদের আবেদনপত্র জামাতের সদর/মুবাল্লিগ ইনচার্জ/ জেলা আমীরের প্রত্যায়িত স্বাক্ষর ও মোহর সহ নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন। ১০) ইন্টারভিউ-এর সময় আসল সনদ গুলি সঙ্গে আনতে হবে।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য অফিসে কাজের দিনগুলিতে এই নম্বরে যোগাযোগ করুন। (সময়: সকাল ৮টা থেকে দুপুর ২টা)

ই-মেল: diwan@qadian.in

Office: 01872-501130, 9646351280

হাজার হাজার সংখ্যায় বিভক্ত ও খানকা ও মাজারে তারা মাথা ঠুকছে (সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে লক্ষ্য করে দেখুন এই পন্থাই চলছে) হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আরো বলেন, পবিত্র মদীনা শরীফে না গিয়ে বরং আজমীর বা অন্যান্য খানকাতে উলঙ্গ পায়ে ও উলঙ্গ মাথায় তারা ছুটছে। এসব ঘাটে ঘাটে পবিত্রতা লাভের অমূলক ধারণা নিয়ে তারা ঘুরে ফিরছে। মাজারগুলোতে ওরসের মৃত্যুবার্ষিকীর নামে অনুষ্ঠিত মেলাগুলো তারা দেখে বেড়ায়। আর সে সব মেলায় ধর্মের নামে ঐ সব দৃশ্যাবলী দেখে মুসলমানদের অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে।

তিনি আরো বলেন, ইসলামের জন্য খোদা তা'লার যদি আত্মাভিমান না থাকতো আর 'ইন্নাদদ্বীনা ইন্দাল্লাহিল ইসলাম' (অর্থাৎ নিশ্চয়, ইসলামই আল্লাহ্ তা'লার মনোনীত একমাত্র ধর্ম) খোদা তা'লার পবিত্র বাক্য না হত আর তিনি যদি না বলতেন, 'ইন্না নাহনু নাযযালনায যিকরা ওয়া ইন্না লাহু লা হাফেযুন' (অর্থাৎ আমরাই এই ধর্ম অবতীর্ণ করেছি আর আমরাই এর রক্ষনাক্ষেণকারী) তাহলে আজ ইসলামের এই করুণ দশা মেনে নেওয়া ছাড়া অবশ্যই কোনও গত্যন্তর থাকতো না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার আত্মাভিমান উদ্দীপিত হয়েছে। তাঁর করুণা ও রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি পূরণার্থে তিনিই রসুলুল্লাহ্ (সা.) এর 'বুরুজ' (প্রতিচ্ছায়) কে পুনরায় অবতীর্ণ করেছেন। আর এই যুগে এই ভাবে তাঁর (সা.) নবুয়াতকে নব শক্তিতে জীবন্ত করে দেখিয়েছেন। অতএব, তিনিই এই জামাত প্রতিষ্ঠিত করেছেন, আর আমাকে প্রত্যাদিষ্ট সংস্কারক 'মাহদী বানিয়ে প্রেরণ করেছেন।

সুতরাং, উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে অনেক বড় এক উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে, যে কারণে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আবির্ভূত হয়েছেন আর এই জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মহানবী (সা.)এর নবুয়ত ও তাঁর মর্যাদা ও সম্মান তখনই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে যখন আমরা নিজেদের অভ্যন্তরীণ অবস্থাকে রসুলুল্লাহ্ (সা.)এর আদর্শের রঙে প্রকৃতই রঙীন করে তুলব। আর সেই ছাঁচে নিজেদেরকে গড়তে তুলতে সচেষ্ট হব। সেই আদর্শে নিজেদেরকে গড়ার জন্য আমাদের জন্য জরুরী হল মহানবী (সা.) এর ইবাদাতের সেই অতুলনীয় মান ধরে রাখা এবং অন্যদেরকে তাদের অধিকার প্রদান করা। এ প্রসঙ্গটি স্মরণ করাতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে আমি বর্ণনা করে থাকি এবং আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকি। সেসবের প্রতি মনোযোগ দেওয়া উচিত।

আমাদের প্রথম কাজ তো হল মহানবী (সা.) প্রদত্ত সেই নির্দেশনাগুলোকে নিজেদের দৈনন্দিন জীবনের অংশ বানিয়ে জগতকে নমুনারূপে দেখিয়ে দেওয়া। আর এটাই হল সেই জিনিষ যা দুনিয়াকে বলে দেবে যে, ইনিই হলেন মহানবী (সা.), যাঁর পদঙ্ক অনুসরণের সর্বাত্মক চেষ্টা আমরা করছি, বিশেষ আগ্রহ-উদ্দীপনার সাথে প্রচেষ্টা চালাচ্ছি আর এরই মাঝে মহানবী (সা.)-এর জীবিত নবী হওয়ার সাক্ষ্য বিদ্যমান।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এ প্রসঙ্গে অন্যত্র বলেন- খোদা তা'লার অনুগ্রহ সঙ্গে না থাকলে খোদা তা'লার মনোনীত মহান ধর্মের নাম-চিহ্ন কবেই মিটে যেত। তবে তিনি যেহেতু প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ***'ইন্না নাহনু নাযযালনায যিকরা ওয়া ইন্না লাহু লা হাফেযুন'*** । রক্ষা করার এই প্রতিশ্রুতির বাস্তব চাহিদা এটাই যে, পতনোন্মুখ কালে এই সুরক্ষা দৃশ্যমান হয়ে ওঠে।

প্রহরীদের কাজ হল লুকিয়ে থাকা লোকদের জিজ্ঞাসাবাদ করা এবং অন্যান্য অপরাধীদেরকে অপকর্মে লিপ্ত দেখলে বিধি-সম্মত দায়িত্ব পালন ও এর প্রতিবিধান করা। অনুরূপভাবে, যেহেতু আজকাল বিদ্রোহী শক্তি-শত্রুরা সবাই একত্রে মিলে সম্মিলিতভাবে ইসলামের দূর্গের উপর সর্বপ্রকার মারুমুখী রণসাজে সজ্জিত হয়ে আঘাত হানছে, এজন্য খোদা তা'লা চেয়েছেন যে,তিনি 'মিনহাজিন নবুওয়ত' প্রতিষ্ঠিত করেন।

ইসলামের বিরোধিতা সত্ত্বেও পকৃতপক্ষে তিনিই এক দীর্ঘকাল পর্যন্ত ধর্মকে সুরক্ষিত ও পবিত্র রেখেছেন। কিন্তু মন্দের প্রাদুর্ভাব ঘটার সময়, শুরুতে যেমন ভ্রূণ হয় আর সেই ভ্রূণ সুনির্দিষ্ট এক মেয়াদকাল কাটানোর পর 'শিশু' হয়ে ভূমিষ্ঠ হয়। একইভাবে ইসলামের বিরোধিতায় শিশু ভূমিষ্ঠ হয়ে এখন পূর্ণ বয়সে উপনীত হয়ে যৌবনের উদ্দীপনাপূর্ণ প্রবল শক্তি লাভ করেছে, তাই একে ধ্বংস করার জন্য খোদা তা'লাই আকাশ থেকে এক যুদ্ধে অবতরণ ঘটিয়েছেন এবং ছলনাময় এই শিরক যা অভ্যন্তরীণরূপে ও বাহ্যিকভাবে সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে তা দূর করতে খোদা তা'লাই একত্ব ও এর প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে এই জামাত প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অতএব, এই সিলসিলা খোদা তা'লার পক্ষ থেকে আর আমি দৃঢ়তাপূর্ণ সুনিশ্চিত দাবির সাথে বলছি যে, এসব অবশ্যই খোদা তা'লার পক্ষ থেকে, তিনি স্ব-হস্তে এই এই প্রতিষ্ঠান দাঁড় করিয়েছেন, যেমনটা তিনি এই জামাতের প্রতি নিজের সাহায্য ও সমর্থন দ্বারা প্রকাশ করে দেখিয়েও দিয়েছেন।

অতএব, আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য ও সমর্থন হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর মাধ্যমে এই জামাতের সাথে অবধারিতরূপে সম্পৃক্ত করে দেওয়া হয়েছে। প্রতিনিয়ত এই জমাতের যে উন্নতি হচ্ছে এটাই তার জলজ্যন্ত সাক্ষী। কিন্তু আমাদেরও নিজের হিসাব-নিকাশ নেওয়ার আবশ্যকতা রয়েছে যে, তৌহিদ ও এর প্রবাবের জন্য এবং ইসলামের অনুপম শিক্ষা বিস্তারের জন্য আমাদের কর্ম-প্রচেষ্টা কী?

এ বিষয়ে আল্লাহ্ তা'লার প্রকৃত ভালবাসা প্রতিষ্ঠিত করার উপায় প্রসঙ্গে সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন-

সকল নবী আলাইহিমুস সালাম গণের আবির্ভাবের অভিন্ন উদ্দেশ্য এই হয়ে থাকে যে, আল্লাহ্ তা'লার ভালবাসা সঠিক ও সত্যিকারভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে আর মানব সন্তানের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও পারস্পরিক সহমর্মিতার এক বিশেষ রঙ সৃষ্টি করে দেওয়া হবে। যতক্ষণ বিষয়টি এমন না হচ্ছে সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও কার্যক্রম নিছক একটি প্রথা বা রীতি-সর্বস্ব হবে।

আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ভালবাসার বিষয়ে আল্লাহ্-ই ভাল জানেন। বলা হয়ে থাকে, তাঁকেই (আল্লাহকে) আমি আমার হৃদয় গহীনে রেখেছি, আল্লাহ্ তা'লাই ভাল জানেন। কিন্তু ফল দেখে বৃক্ষ চেনা যায়। যেমন কোন বৃক্ষের তলায় কোন ফল পড়ে থাকতে দেখলে বোঝা যায় ঐ গাছে কোন ফল ধরেছে, কিন্তু গাছের তলায় কিছুই যদি দেখতে পাওয়া না যায় তবে উপরে- গাছে কী ফল ধরে আছে তা কি করে জানা সম্ভব হতে পারে! অনুরূপবাবে, মানব সন্তানাদের মধ্যে নিজেদের-নিকটজনদের সাথে সৌহার্দ্য ও ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ দেখা গেলে এই সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে যে, ভ্রাতৃত্বপূর্ণ এই সম্পর্ক আল্লাহ্ তা'লা প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন। একই সাথে এই অবস্থা দৃষ্টে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্ তা'লার সাথেও তাদের নিষ্ঠাপূর্ণ ভালবাসার সম্পর্ক বিদ্যমান। বিশেষভাবে এটা উপলব্ধি করার বিষয়। সাধারণভাবে লোকজনদের সাথে এবং নিকটজনদের সাথে সৌহার্দ্য ও সহমর্মিতার বিশেষ যে সম্পর্ক দৃশ্যমান হয়, আল্লাহ্ তা'লাই তা গড়েন। একে অপরের সাথে সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি ও ভালবাসার যে সম্পর্ক তার নির্দেশ আল্লাহ্ তা'লাই দিয়েছেন। আর এর থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, যাদের মধ্যে ভালবাসাপূর্ণ এই সুসম্পর্ক রয়েছে আল্লাহ তা'লার সাথেও তাদের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। অন্যথায় এটা তো জানা নেই যে, আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ভালবাসা প্রকৃতই আছে না নেই। এর প্রকাশ আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্টির প্রতি ভালবাসা দৃশ্যমান হলে তবেই বোঝা যায়, এর মাধ্যমে তা প্রকাশ পায়।

এ প্রসঙ্গে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, মানবাধিকারের প্রতি সচেতনতা ও ভ্রাতৃত্ব পারস্পরিক সহমর্মিতা সৃষ্টি করে। যা আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ভালবাসার রঙ থেকেই সৃষ্ট। দেখ! দুনিয়টা কয়েকদিনের।

আর অগ্রে ও পশ্চাতে যারা রয়েছে, সবাই মৃত্যু-পথযাত্রী। আনসারুল্লাহ্ সদস্যদের বয়স ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে, বৃদ্ধও হয়ে যাচ্ছে। বরং আনসারুল্লাহ্-য় প্রবেশ করার সাথে সাথে এই ধারণা হয়ে যায় যে, এখন আমরা এমন বয়সে পদার্পণ করছি যা আমাদের বয়স সীমার শেষ প্রান্তের দিকে ধাবিত হচ্ছে। তিনি (আ.) বলেন, ইহজগত কয়েকদিনে। তোমার পুর্বপ্রজন্ম ও ভবিষ্যত প্রজন্ম সবই মৃত্যু পথযাত্রী। কবর মুখ খুলে হা করে অবিরত ডাকছে। আর প্রত্যেককে তার পরিণতিতে প্রবেশ করতেই হবে। শত চেষ্টাতেও আয়ুষ্কাল বাঁধ দিয়ে ঠেকিয়ে রাখা যায় না, জীবনও থেমে থাকে না। আরো ছয় মাস বা তিন মাস বেঁচে থাকব- ধারণা করা যায় কি? এই বিশ্বাসটুকুও নেই যে, এক পা ফেলার পর দ্বিতীয় পা ফেলা পর্যন্ত বাঁচবো কি না!

অতএব, অবস্থা এমনই সুস্পষ্ট যে, মৃত্যুর দিনক্ষণ জানা নেই। আর চূড়ান্ত কথা এটাই। নিশ্চিত ও সুদৃঢ় সত্য এটাই। আর এই সত্য ভুলবার নয়। অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তির জন্য অপরিহার্য যে, এ মুহূর্তটির জন্য সে সর্বদাই প্রস্তুত। এজন্যই কুরআন শরীফে বলা হয়েছে- ***'লা তামুতুন্না ইল্লা ওয়া আনতুম মুসলেমুন'।*** প্রতি মুহূর্তেই মানুষ খোদা তা'লার সাথে নিজ হিসেব-নিকেশের বিষয়াদি যতক্ষণ স্বচ্ছ করে না নিচ্ছে এবং নিজের উপর বর্তানো দুটি দায়িত্ব পুরোপুরি আদায় না করছে ততক্ষণ কাজের কাজ কিছুই হয় না। যেমন আমি বলেছি, অধিকারও দুই ধরণের- ১) হুকুকুল্লাহ্ এবং (২) হুকুকুল ইবাদ। অতএব বয়স গোধুলি লগ্নে প্রবেশের সাথে সাথে এই দুই ধরণের অধিকার আদায়ের প্রতি আমাদের বিশেষভাবে মনোযোগ দেওয়ার অনেক বেশি প্রয়োজন রয়েছে।

আমাদের নিজের কেমন হওয়া উচিত এ প্রসঙ্গে জামাতকে আরও উপদেশ দিয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, এই জামাত খোদা তা'লাই যখন প্রতিষ্ঠা করেছেন আর এর সাহায্যার্থে ও সমর্থনে শত শত নিদর্শন প্রকাশিত করেছেন, এথেকে প্রতীয়মান হয় যে, এটা সাহাবাদের জামাত। অতএব 'খাইরুল কুরুন' সর্বোৎকৃষ্ট এর যুগ। যারা এই জামাতে যোগদান করে, যেহেতু তারা 'আখারীনা মিনহুম' (পরবর্তীতের মধ্যে আবির্ভূত) এর অন্তর্ভুক্ত, তাই তারা ইহজ জাগতিকতার মিথ্যা ভূষণ ত্যাগ করে খোদা তা'লার সমীপে সর্বোতভাবে নিবেদিত হন।-ফেজ্জে অউজ অর্থাৎ

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

" তুচ্ছ এ জীবন যাকে নিয়ে এত গর্ব করা হয়। চিরন্তন আনন্দের জীবন সেটিই যা মৃত্যুর পর লাভ হয়।"

(মমালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬১৬)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

বিদ্রোহী শক্তির বক্রতার বলি হয়ে যান তারা। এরপর হল ইসলামের তিনটি যুগ-সন্ধি কাল- ১) কুরুনে সালাসা (তৎসন্নিহিত তিন শতাব্দী) এরপর ২) ফেজ্জে অউজ (বক্রতা) এর যুগ।

এই যুগ সম্পর্কে রসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, 'লাইসা মিন্নি ওয়া লাসতা মিনহুম' অর্থাৎ সে না আমার থেকে আর না আমি তাদের মধ্য থেকে। অতঃপর তৃতীয় যুগ হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর, যা রসুলুল্লাহ্ (সা.) যুগের সাথেই সংশ্লিষ্ট, প্রকৃত অর্থে এটা রসুলুল্লাহ্ (সা.) এরই যুগ। রসুলুল্লাহ (সা.) 'ফেজ্জে অউয' এর উল্লেখ যদি না-ও করতেন তবুও পবিত্র কুরআন আমাদের হাতে রয়েছে আর আয়াত 'আখারীনা মিনহুম লাম্মা ইয়ালহাকুবিহিম ' (অর্থাৎ তাদেরই মাঝ থেকে অন্যদের প্রতিও তিনি তাকে আবির্ভুত করবেন, যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হয় নি') সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিচ্ছে যে, এমন যুগ-কালও রয়েছে যা সাহাবাদের আদর্শের পরিপন্থী আর সেই বাস্তব ঘটনাবলী বলে দিচ্ছে যে, সেই হাজার বছরকালের মাঝে ইসলাম অনেক অনেক বিপজ্জনক ও মারাত্মক আক্রমণের লক্ষ্যস্থল ছিল।

নির্দিষ্ট স্বল্প সংখ্যার সাহাবীরা ছাড়া সবাই ইসলামকে ত্যাগ করেছে এবং বহু ফিরকা -মুতাজিলা (কুরআনকে মানবসৃষ্ট জ্ঞান করে) ও ইবাহাতী (হারামকে সিদ্ধ জ্ঞান করে ও বৈধতা দেয়) ইত্যাদি বহু দল উপদল সৃস্টি হয়ে যায়। এখন আবার আরেক যুগ এসেছে- ইসলামের বদনামের যুগ। ইসলামী শিক্ষার অনুশীলন লোকেরা ছেড়ে দিয়ে বসে আছে। আর দুর্ভাগ্যকমে মুসলিম আলেমগণের বানোয়াট শিক্ষা ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের অনুসরণ করে 'যুগ ইমাম' এর আনুগত্য করছে না বরং তাঁকে প্রত্যাখ্যান করছে। ইসলাম থেকে দূরে সরে যাওয়ার পদ্ধতি যদিও পাল্টে গেছে তবুও সাধারণ মানুষকে ইসলাম থেকে দূরেই সরানো হচ্ছে। যারা কাছে ভিড়ছে তারাও প্রকৃত পক্ষে ইসলামী শিক্ষা থেকে সরে যাচ্ছে। তিনি (আ.) আরো বলেন, আমাদের এই কথার স্বীকারোক্তি রয়েছে যে, কোন যুগ এমন কাটে নি জগতে যখন ইসলামের কল্যাণ প্রদানকারী অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল না। তবে আল্লাহ্‌র সেই বান্দা ও আওলিয়া সেই মধ্যবর্তী যুগ যারা কাটিয়েছেন, তাদের সংখ্যা এতই নগণ্য ছিল যে, কোটি কোটি সেই লোকদের সংখ্যার তুলনায় যারা 'সিরাতুল মুস্তাকীম' লঙঘন করে ইসলাম থেকে বহু দূরে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল, তাদের তুলনায় এই সংখ্যা উল্লেখ করার মত কিছুই ছিল না।

এজন্য রসুলুল্লাহ্ (সা.) এর দূরদৃষ্টির চোখ এই যুগকে প্রত্যক্ষ করেছে, আর নাম তিনি 'ফেজ্জে অউজ' (বক্রতার যুগ) রেখেছেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা ইচ্ছা করেছেন যে, এমন এক বৃহৎ সংখ্যা তিনি সৃষ্টি করবেন যাদেরকে সাহাবাদের অংশে মিলিয়ে দেওয়া হবে। তবে যেহেতু খোদা তা'লার নিয়ম রীতি এটাই যে, তাঁর প্রতিষ্ঠিত জামাত বর্ধিত হারে বৃদ্ধি লাভ করে থাকে। এজন্য আমাদের জামাতের উন্নতিও উর্বর জমির অধিক ফলনশীল শস্যের ন্যায় আর সেই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অধিক ফলনশীল সেই বীজের মতই ভূমিকে বপন করা হয়ে থাকে। সেই মহান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, আল্লাহ্ তা'লা এই জামাতকে যেখানে পৌঁছাতে চান, আজও তা অনেক দূর। তা অর্জিত হতে পারে না যতক্ষণ মর্যাদাপূর্ণ সেই বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি না হয়, যা এই জামাত প্রতিষ্ঠিত করার পেছনে আল্লাহ্ তা'লার পরিকল্পনা রয়েছে।

জামাতের উন্নতি প্রসঙ্গে লোকেরা কথাবার্তা বলে। তবে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব তো জামাতের সেই অংশের উপর বর্তায় যারা আনসারুল্লাহ্‌র বয়সে পদার্পণ করেছে, পরিপক্কতার উচ্চ স্তরে যারা উপনীত হয়েছে। যাদের চিন্তা-চেতনায়ও পরিপক্কতা এসেছে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, জামাত প্রতিষ্ঠায় খোদা তা'লার যে অভিপ্রায় রয়েছে যতক্ষণ তাদের মধ্যে সেই সব বৈশিষ্ট্যসমূহ সৃষ্টি না হচ্ছে- তৌহিদের ঘোষণা প্রদানেও আর সেই অঙ্গীকার প্রতিপালনেও বিশেষ রঙ থাকতে হবে, যা দুনিয়া থেকে পৃথক করে আল্লাখ মুখী করে। যিকরে ইলাহিতে এক বিশেষ তাৎপর্য দৃশ্যমান হবে। পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বের মধ্যেও বিশেষ গভীরতাপূর্ণ রঙ দেখা দিবে।

অতএব, এই হচ্ছে সেই সব অনুপম গুণাবলী, যা সৃষ্টি করার আবশ্যকতা আমাদের রয়েছে। কুরআন করীমের কল্যাণসমূহ আর আমাদের কর্তব্য ও দায়িত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আরও বলেন- অতএব স্মরণ রাখা উচিত , পবিত্র কুরআনই পূর্ববর্তী কিতাব আর নবীদের উপর অনুগ্রহ করেছে। তাঁদের (আ.) যেসব শিক্ষামালা কেচ্ছা-কাহিনী রূপে ছিল সেগুলোকে জ্ঞানপূর্ণ করে দিয়েছে। আমি সত্য সত্যই বলছি, কোন ব্যক্তি সেই সব কেচ্ছা-কাহিনীর দ্বারা মুক্তি পেতে পারে না, যতক্ষণ তারা পবিত্র কুরআন পাঠ না করছে। কেননা কুরআন শরীফের-ই এই মর্যাদাপূর্ণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে, সেই কিতাব 'ইন্নাহু লে কাওলু ফাসলুন ওয়া মাহুওয়া বিল হাযলে", সে-ই হচ্ছে মিযান (পরিমাপকারী নিক্তি) মুহায়মিনুন নূর (ভারসাম্যকারী জ্যোতি) ও শিফা (আরোগ্যদানকারী) এবং রহমত (কৃপাকারী)। যেসব লোকেরা কুরআন শরীফ পাঠ করে আর একে কেচ্ছা-কাহিনী ভাবে, তারা কুরআন শরীফ পাঠ করে নি বরং এর অবমাননা করেছে।

তিনি (আ.) আরও বলেন, আমাদের বিরোধীরা আমাদের বিরোধিতায় কেন এমন মরিয়া হয়ে উঠছে? কেবল এজন্যই যে, কুরআন শরীফকে খোদা তা'লা যেভাবে বলেছেন, ঐ কিতাব সরাসরি জ্যোতির্ময় প্রজ্ঞাপূর্ণ এক তত্ত্ব-দর্শন, যা আমাদের আলোকিত করতে চায় আমরা তা বিশ্বাস করি, আর তারা সাব্যস্ত করতে চেষ্টা করে কুরআন শরীফ এক অতি সাধারণ কেচ্ছা-কাহিনীর কিতাবের চেয়ে বেশি কিছু নয়। আমরা তাদের পক্ষে সাফাই গাইতে পারি না, খোদা তা'লা নিজ অনুগ্রহে আমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন, কুরআন শরীফ সদা জীবিত ও জ্যোতির্ময় এক কিতাব। এ অবস্থায় তাদের বিরোধিতার পরোয়া কেন আমরা করব? বরং আমি বর বার ঐ নির্দেশনা এই বৈশিষ্ট্যের প্রতি, ঐ লোকদের প্রতি যারা আমার সাথে সম্পর্ক রাখে, উপদেশ দিয়ে থাকি যে, খোদা তা'লাই এই জামাতকে সত্য-দর্শন প্রতিষ্ঠা করার জন্য দাঁড় করিয়েছেন, কেননা মন্দ প্রকৃতির লোকদের ব্যবহারিক জীবনে কোন উজ্জ্বলতা ও জ্যোতি সৃষ্টি হতে পারে না। ব্যবহারিক জীবনে সত্যের মধ্যমে ইসলামের সৌন্দর্য জগতে প্রকাশিত হোক, এটাই আমার কামনা। যে কাজের জন্য খোদা তা'লা আমাকে প্রত্যাদিষ্ট করেছেন। এজন্য গভীর মনোযোগের সাথে বার বার কুরআন শরীফ পাঠ কর। তবে কেচ্ছা-কাহিনী ভেবে নয় বরং এক গভীর তত্ত্ব-জ্ঞান পূর্ণ ভান্ডার মনে করে পাঠ কর।

আমাদের রিপোর্টগুলোতে নানাবিধ বিষয়াদির উল্লেখ থাকে। কায়েদ সহেবগণ উল্লেখগণ করে থাকেন যে, এই চেষ্টা করা হচ্ছে-সেই প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে-এত এত আমাদের লক্ষ্যমাত্রা-এতজন নিয়মিত কুরআন শরীফ পাঠ করে থাকেন। তবে এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা আমাদের কোনও লক্ষ্য নয় যতক্ষণ না আনসারদে মধ্য থেকে শতভাগ আনসার নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াতকারীতে পরিণত না হচ্ছে। এটা আনসারুল্লাহ্‌র অনেক বড় দায়িত্ব। আর এটাই হচ্ছে সেই নমুনা, যা সন্তানদের তরবিয়তের উপরও প্রভাব ফেলে। আর এটাকে সমুন্নত রাখতে পারলে আপনারা প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হবেন।

এক স্থানে এই জামাত খোদা তা'লার পক্ষ থেকে প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রসঙ্গে তিনি (আ.) বলেন-

তারা গভীর ষড়যন্ত্র এঁটেছে, খুনের মিথ্যা মামলায় জড়ানোর চেষ্টাও করেছে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয় তা বৃথা হতে পারে না। আমি তোমাদেরকে সত্য সত্যই বলছি, এই মহান বিপ্লব খোদার পক্ষ থেকে, যদি মানুষের অভিসন্ধি ও মানবীয় প্রচেষ্টার ফলশ্রুতির কাজ এটা হত তাহলে মানুষের চেষ্টা-প্রচেষ্টা আর প্রচন্ড বিরোধিতা একে টুকরো টুকরো কলে ফেলত। মানুষের বিরোধিতাপূর্ণ দূরভিসন্ধির মোকাবেলায় এর বেড়ে ওঠা ও উন্নতি করা, এর খোদা তা'লার পক্ষ থেকে হওয়ারই সত্যতা সাব্যস্ত করে।

অতএব, তোমরা, তোমাদের বিশ্বাসে দৃঢ়তায় যত শক্তিশালী হয়ে উঠবে তোমাদের অন্তর্লোক তত আলোকজ্জ্বল হবে।

আর বিশ্বাসে দৃঢ়তা তখনই শক্তিশালী হয় যখন ধর্ম অনুধাবন ও তা পালনে মনোনিবেশ করা হয়। অতএব শুরুতে আমি যেমনটি বলেছি, বিশ্বকে আহমদীয়াতের সাথে পরিচয় করানোর আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য ও সমর্থনের অবিরাম ধারা তো আমরা প্রত্যক্ষ করেই চলেছি, এতে আমাদের কোন চেষ্টা-প্রচেষ্টা নেই, মানুষের অন্তর খুলে যাচ্ছে, মানুষ আহমদীয়াত মুখী হয়ে ধর্মের দিকে প্রত্যাবর্তন করছে।

আল্লাহ্ তা'লা তাদের ঈমান ও বিশ্বাস কিভাবে বৃদ্ধি করছেন, এ থেকে কয়েকটি ঘটনা আমি এখন আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব। কিন্তু তার আগে আমি পুণরায় একটি উদ্ধৃতি তুলে ধরছি, যা তিনি (আ.) জামাতকে নসীহত করতে গিয়ে বলেছেন-

তিনি (আ.) বলেন, কুরআন করীম পাঠ কর এবং খোদা তা'লা থেকে কখনই নিরাশ হয়ো না। মুমিন কখনও খোদা থেকে হতাশ হয় না। এটি কাফেরদের অভ্যাস, খোদা তা'লা থেকে সে হতাশ হয়ে যায়। আমাদের খোদা তা'লা 'আলা কুল্লে শাইইন কাদির' কুরআন শরীফের অনুবাদও পড় এবং নামায সমূহ, এর অর্থ বুঝে পড়, পরিপাটি করে পড়। নামাযে নিজ ভাষায় দোয়া কর। কুরআন শরীফকে একটি সাধারণ পুস্তক জ্ঞান করে পাঠ করো না বরং একে খোদা তা'লার বাণী মনে করে পড়। নামাযসমূহকে ঠিক সেইভাবেই পড় যেভাবে রসুলুল্লাহ্ (সা.) পড়তেন। নামাযের প্রকৃত সারমর্ম ও প্রাণ হচ্ছে দোয়া।

অতএব, এই সমস্ত কথা-ই গুরুত্বের সাথে আমাদের মানসপটে রাখা উচিত, যেন আমরা আমাদের বয়আতের অঙ্গীকার পূর্ণ করতে পারি এবং আমাদের এই সংগঠনের নামের সম্মান রক্ষা করতে পারি। যেভাবে আমি বলেছি, এই সিলসিলার উন্নতির প্রতিশ্রুতি রয়েছে আর তা পূর্ণ হবে এবং হচ্ছে। কোন মানুষের হাত উন্নতি ও অগ্রগতির এই পথে বাধা হতে পারে না। আমাদের উপর খোদা তা'লার এটি একটি অনুগ্রহ যে, যদি আমরা তাঁর ধর্মের প্রচারের জন্য যৎসামান্য চেষ্টা-প্রচেষ্টাও করি তাহলে তিনি আমাদের পুরস্কারে ভূষিত করেন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ও বলেছেন যে, সব ধরণের বিরোধিতা সত্ত্বেও ঐশী জামাতের উন্নতি হয় এবং হবে কেননা

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"সেই লোকগুলি তোমাদের আদর্শ যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'কোন ব্যবসা, বানিজ্য ও কেনাবেচা তাদেরকে আল্লাহ্‌র যিকর বা স্মরণ থেকে বাধা দেয় না।" *(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১০৪)*

দোয়াপ্রার্থী: Nurjahan Begum, Kolkata (W.B)

যেভাবে আমি বলেছি এটি মানুষের তৈরী কোনও জামাত নয়। আর এই সব উন্নতি অবিরতই হচ্ছে আর আর তা কিভাবে হচ্ছে আমি এখন তার কয়েকটি ঘটনা বলছি-

কঙ্গোর জলসা সালানায় এক যুবক এল। সে বলল, আমি গত পাঁচ বছর যাবৎ জামাতের উপর গবেষণা চালিয়েছিলাম। নিরবতার সাথে জামাতের সকল অনুষ্ঠানাদিতে আমি অংশ গ্রহণ করছিলাম আর কারো কাছেই কিছু প্রকাশ হতে দিই নি। তবে আমি জামাতের কর্মকাণ্ড ও শিক্ষাদীক্ষার প্রতি লক্ষ্য রাখতে শুরু করি এবং পর্যালোচনা করতে থাকি। যখন আমি আশ্বস্ত হলাম তখন, এই বছরই আমি বয়আত করি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, 'আহমদীয়া মুসলিম জামাত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। এখন দেখুন, এই যুবকের হৃদয়ে এটি সঞ্চারিত করেছে কে? এটি আল্লাহ্ তা'লার তকদীর কাজ করেছে। আর এমন ঘটনা দু'একটি নয় বরং অগণিত সংখ্যায় এমন ঘটনা রয়েছে।

যুক্তরাজ্যের জলসা সালানা যা সম্প্রতি সম্পন্ন হয়েছে, এখানকার একজন ইংরেজ মহিলাও আমাকে লিখেছে যে, দীর্ঘ সময় ধরে গবেষণা করছিলাম কিন্তু জলসার পরিবেশ দেখে আমার মনোযোগ নিবদ্ধ হল আর আমি বয়আত গ্রহণ করলাম।

এরপর, আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য সমর্থনের আরও একটি ঘটনা এরূপ যা বর্ণনা করেছেন আমাদের ঘানার ন্যাশনাল সেক্রেটারী তবলীগ জনাব ইউসুফ এডু সাইদ সাহেব। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লা কিভাবে সাহায্য ও সমর্থন করছেন এবং মানুষের হৃদয় আহমদীয়াতের দিকে আকৃষ্ট করছেন এবং আহমদীয়াতের সত্যতাকে প্রকাশ করছেন। তিনি বলেন, লাম্বুনা নামক স্থানে আমাদের একজন 'দাঈ ইলাল্লাহ' আব্দুল্লাহ্ সাহেবকে তবলীগ করার সময় তাঁকে বৃষ্টির জন্য দোয়া করতে বলা হয়। এতে করে তিনি ঘোষণা দিলেন, যেহেতু তিনি ইমাম মাহদীর বাণী পৌঁছনোর জন্য তবলীগ করছেন, এ কারণে তাঁর দোয়া কবুল হবে। এই বিশ্বাস দূর-দূরান্তের এলাকার লোকদের মনেও সঞ্চারিত হল। সেই সমস্ত লোকেরা যারা আহমদী হয়েছে তারা যথাযথভাবেই হযরত মসীহ মওউদ (আ.)এর বাণীকে অনুধাবন করেছে। যাইহোক তিনি বলেন, তিনি দোয়া করলেন এবং দোয়া করালেন এবং বললেন, এখন অবশ্যই বৃষ্টি হবে। খোদা তা'লার ফজলে সেই রাতেই, রাত ৯টার সময় মুষলধারে বৃষ্টি হয় আর দোয়া কবুলিয়্যতের এই নিদর্শন দেখে সেই এলাকার লোকদের এক বড় সংখ্যা আহমদীয়াত গ্রহণের তৌফিক পেয়েছে। (আলহামদোলিল্লাহ)। এগুলো ছোট ছোট ঘটনা কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা যখন বিশ্বাস সঞ্চরিত করেন তবলীগ কারীর হৃদয়েও আর তার আমলও যদি তদনুযায়ি হয় তাহলে এর ফলাফলও সীমা ছাড়িয়ে মহানই হয়ে থাকে।

আবার ইউরোপে আগত এক ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'লা এভাবেই আহমদীয়াতের সত্যতা সম্পর্কে অবগত করেছেন। আমাদের কসোভোর মুবাল্লিগ সামাদ সাহেব বলেন, একজন নিষ্ঠাবান যুবক কালতুন সাহেবের আহমদীয়াত গ্রহণের তৌফিক লাভ হয়েছে। তার পুরো নাম মোস্তফা কালতুন। মোস্তফা সাহেব কয়েকমাস যাবৎ তবলীগাধীন ছিলেন। রসায়ন ও জীববিদ্যায় তিনি স্নাতক ডিগ্রিধারী। একটি তবলীগি সভায় তিনি তার একটি আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার কথা শুনিয়েছেন। তিনি বলেন, এক রাতে তিনি প্রতিদিনের ন্যায় সকালে ওঠার জন্য মোবাইলে এলার্ম দিয়ে ঘুমিয়েছেন। সকালে যখন এলার্ম বেজে উঠল তখন তিনি এলার্ম বন্ধ করে উঠতে না উঠতেই হঠাৎ তারে কানে এক আওয়াজ এল- 'আহমদীাত থেকে দূর যেও না।' এটি শোনামাত্রই তিনি উঠে বসলেন আর এই বাণী তার হৃদয়ে এতটা গভীর রেখাপাত করল যে, সেই সপ্তাহেই জুমআর দিনে তিনি বয়আত ফর্ম পূরণ করে ইসলাম আহমদীয়াত গ্রহণ করেন।

এই সকল নমুনা যা আল্লাহ্ তা'লা দেখিয়ে থাকেন এটি বোঝানোর জন্য যে, তিনি চাইলে প্রত্যেকের হৃদয়কে এভাবেই আকৃষ্ট করতে পারেন। অতএব, এটি তোমাদের কৃতিত্ব নয় যে, তোমরা তবলীগ করলেই আহমদীয়াতের প্রসার ঘটবে। যে ধর্মের প্রসার নিদর্শানবলীর মাধ্যমে হয় তা অত্যন্ত দ্রুতার সাথে প্রসারিত হয়। সুতরাং প্রথমত যেখানে আমাদের নিজেদের মধ্যে পরিবর্তন সৃষ্টি করা উচিত সেখানে খোদা তা'লার নির্দেশাবলীর উপর আমল করে, নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করেও এমন পরিবেশ সৃষ্টি করা উচিত যেন খোদা তা'লা আমাদেরকে অসাধারণ নিদর্শনাবলী দেখান।

ইউসুফ উসমান গামবালাহ সাহেব যিনি তানজানিয়ার রিজিওনাল মোবাল্লেগ, তিনি সুঙ্গয়া থেকে লিখেছেন, সুঙ্গয়া রিজিওনে একটি জামাত রয়েছে আর সেখানকার তিনজন লোক খাকসারের জেরে তবলীগে ছিলেন এবং তাদের সাথে কোন না কোন বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা হতই। একদিন তারা মিশন হাউসে এলেন এবং কথাবার্তার এক পর্যায়ে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ছবি তারা দেখলেন এবং বললেন , এটা কোন মিথ্যাবাদী ব্যক্তির ছবি হতেই পারে না। তারা তখনই হযরত মসীহ মওউদ (আ.)এর বয়আত গ্রহণ করলেন। বয়আত করার পর খোদা তা'লা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করলেন এমনকি তারা এখন আহমদীয়া জামাতের বাণীর প্রসার করছেন এবং নিয়মিত তবলীগ করছেন।

বাইরের আলেমদের অপচেষ্টা সম্পর্কে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) যেভাবে বলেছেন, সর্বত্রই বিরোধিতা রয়েছে কিন্তু খোদা তা'লার তকদীর স্বস্থানে কাজ করে যাচ্ছে এবং তাদের অপচেষ্টা ব্যর্থ ও নিষ্ফল হচ্ছে। আমাদের নাইজেরিয়ার মোবাল্লেগ আসগর আলি ভট্টি সাহেব লিখেছেন, ২০১৩ সালে ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিকে আমরা সওয়াসামিয়া নামক একটি গ্রামে তবলীগ করি এবং পরবর্তীতে সেখান থেকে আট-সদস্য বিশিষ্ট একটি দলকে মিশন হাউসে ডেকে এনে আরও দুই দিন তাদের কাছে জামাতের বিস্তারিত পরিচিতি তুলে ধরি। ইতিমধ্যে নাইজেরিয়ার সালানা জলসার সময় এসে যাওয়ায় তাদেরকে জলসাতেও আমন্ত্রণ জানাই। যখন সেই গ্রামের দলটি জলসায় অংশগ্রহণের জন্য তাদের ইমামের সাথে সেখানকার রাজধানী নিয়ামী পৌঁছায়, তখন সেই গ্রামেরই একটি পরিবার, যারা শিক্ষিত এবং চাকরির সুবাদে নিয়ামীতে-ই বসবাস করে এবং ওহাবী সম্প্রদায়ভুক্ত, তারা এদের এখানে আসার সংবাদ পেয়ে রাতেই এসে দাওয়াতের কথা বলে তাদেরকে নিজেদের বাসায় নিয়ে গেল। সেখানে তারা আগে থেকেই তাদের এক বড় ইমামকে ডেকে এনেছিল। সেই ইমাম সাহেব সর্বাত্মকভাবে সেখানে প্রমাণ করার চেষ্টা চালায় যে, 'আহমদীরা তো কাফের আর আপনারা কাদের কথায় কোথায় জড়িয়ে পড়ছেন। অতিসত্ত্বর তওবাহ করুন এবং 'ওহাবী' হয়ে যান। আমরা আপনাদের মসজিদও বানিয়ে দিব। '

সওয়াসামিয়া গ্রামের ইমাম সাহেব মারাবি মিশন হাউসে ফিরে এসে সেই সাক্ষাত সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে বলেন, আমি ওহাবীদের ইমাম সাহেবকে উত্তরে বলেছি, আপনার এরূপ বিরোধিতাপূর্ণ কথাবার্তার পর জামাতের সত্যতা সম্পর্কে পূর্বে যদি আমার কোন সন্দেহ থেকেও থাকে তবে তা আজ দূর হয়ে গেল। কেননা যখন থেকে এখানে এসেছি আপনাকে শুধুই গালি দিতে শুনছি আর আমি যতক্ষণ জলসাগাহে ছিলাম আহমদীদের কুরআন পাঠ শুনেছি। তাই আমি আপনাকে বলে রাখছি, গোটা দুনিয়ার মুসলমান যদি আহমদী হয়ে যায় কিংবা কমপক্ষে আহমদীদের মত হয়ে যায় তাহলে দুনিয়ায় দ্রুতই শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। এ কথা শোনামাত্রই ওই মৌলবী ভোল পাল্টে বলা শুরু করে, ঠিক আছে। আহমদীয়াত যদি ছাড়তে না-ই চাও, তো ছেড়ো না, তবে গ্রামবাসীকে আমার এই কথাটি পৌঁছে দিও। তিনি বলেন, আমি গ্রামে ফিরে গিয়ে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ওহাবী মৌলবীর সেই কথা পৌঁছে দিই। গ্রামবাসীকে তার সেই কথা (আহমদীরা কাফের) পৌঁছে দিলে তাদের সবারই জবাব একটাই ছিল, 'আমাদের শুধুই আহমদীয়াত চাই'। সবাই বিরোধিতাপূর্ণ সেই বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করে। এখন এই পুরো গ্রামই আহমদীয়াত গ্রহণ করেছে এবং রীতিমত জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে।

এবারে এই দেশ থেকে অন্য দেশের প্রতি দৃষ্টি ফেরানো যাক।

আপনাদের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশের একটি করে বিভিন্ন ঘটনাবলী থেকে ঘটনা নানা আঙ্গিকে আমি বর্ণনা করেছি। ইউরোপের আর আফ্রিকার। আফ্রিকার একটি দেশের নাম গ্যাম্বিয়া। গ্যাম্বিয়ার আমীর সাহেব লিখেছেন, আমাদের তবলীগি টিম নিয়ামিনা ইস্ট জেলার মামতাফানা গ্রামে কয়েকবার তবলীগি সফরে গিয়েছে। এতে সেই গ্রামের ১৫০টি পরিবারের মধ্য থেকে ৯৬টি পরিবার আহমদীয়াত গ্রহণ করে।

বয়আতগ্রহণকারীর সংখ্যা এখন প্রায় দেড় হাজার। এই গ্রাম এবং তার আশপাশের এলাকার সবাই তেজানী ফিরকার অনুসারী। গ্রামবাসীরা আহমদীয়াত গ্রহণ করার বিরোধিরা তৎপর হয়ে উঠল। কতিপয় অ-আহমদী সরকারি কর্মকর্তা, গ্যাম্বিয়ার এক ইসলামি দলের নেতা এবং আরো কিছু আলেম, যাদেরকে সেনেগাল থেকে ডেকে আনা হয়, তারা সবাই উল্লিখিত গ্রামে ছোটাছুটি শুরু করে আর গ্রামের সর্দার (গাঁও আলকালী) এবং গ্রামের কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাথেও দেখা-সাক্ষাৎ করে, যাতে আহমদীয়াতের তবলীগ বন্ধ করা যায় আর যারা আহমদী হয়েছে তাদেরকে ফেরত আনা যায়। এই দলটি উল্লেখিত দুটি গ্রাম ছাড়াও আশেপাশের গ্রামগুলোতেও যায় এবং বিশেষ করে নওমোবাঈনদের কাছে যারা সম্প্রতি আহমদীয়াত গ্রহণ করেছে। এই অ-আহমদী প্রতিনিধি দল প্রথমে তাদের নিজেদের পরিচয় দেয়। অতঃপর বলে, এটা জানানোর জন্য তারা এখানে এসেছে যে, 'আহমদীরা কাফের। তাই কেউ যেন তাদের পিছনে না চলে, তাদের অনুসরণ না করে। পাকিস্তানে তাদের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। এরা কোনও প্রকার ইসলামী কর্মকাণ্ড সেদেশে করতে পারে নাা। পাকিস্তানে যাওয়ার ব্যাপারেও তাদের নেতাদের উপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এখন তারা ইংল্যাণ্ডে আছে। আর আহমদীরা একেবারেই খৃষ্টানদের মত। এজন্য গ্রামবাসীর উচিত আহমদীয়াত গ্রহণ না করা'।

যুগ ইমামের বাণী

তোমরা একথা ভুলে যেও না যে, খোদা তা'লার কৃপা ও অনুগ্রহ ব্যতিরেকে তোমরা আদৌ জীবিত থাকতে পার না। (মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬২৯)

দোয়াপ্রার্থী: Abdus Salam, Nararvita (Assam)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025 Vol-8 Thursday, 29 June, 2023 Issue No.26

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

এর জবাবে নতুন বয়আতকারীরা বলে, আল্লাহ্‌র ফজলে আমরা আহমদী মুসলমান। আর এ কারণে তাদেরকে যদি হত্যাও করা হয় তবু তারা আহমদীই থাকবে। এছাড়া তারা আরো বলে, আহমদী মুসলমানরা ইসলামের যে বাণী পৌছাচ্ছে আসলে এটাই প্রকৃত ইসলামের বাণী। যুগের ইমামকে সনাক্ত করতে পারাই প্রকৃত নেকী আর এরাই হল সৌভাগ্যমণ্ডিত। আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি যে, ফেব্রুয়ারী ২০১৪ থেকে জুন ২০১৪ পর্যন্ত উল্লেখিত এই দুই গ্রামে দুই হাজারের বেশি নও মোবাঈন রয়েছে যারা সবাই আহমদী জামাতভুক্ত।

সৌদি আরবের তত্ত্বাবধানে থাকা আলেমরা বিশৃঙ্খলার মূলে রয়েছে। এবং এরা 'আহমদীয়াত' এর বিরোধিতায় সদা তৎপর। তবে এসব লোক তাদের অপবিত্র কার্যকলাপে কখনও সফল হবে না।

সুতরাং এরা সেই সকল নওমোবাঈন যাদের আহমদীয়াত গ্রহণ করা বেশি দিন হয় নি তবুও আল্লাহ্‌ তা'লা তাদের বিশ্বাসে এতটা দৃঢ়তা দান করেছেন এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর সমর্থনে এমন নিদর্শন দেখিয়েছেন যে, মানুষ তা দেখে হতবাক হয়ে যায়। সুতরাং আল্লাহ্‌ তা'লা চাইলে সমস্ত দুনিয়াকে ধর্মের পানে ফেরাতে পারেন। কিন্তু তিনি আমাদের উপর এই দায়িত্ব অর্পন করেছেন যে তোমরাও তোমাদের অবস্থার পরিবর্তন কর, নিজেদের আমল সমূহে পরিবর্তন আন, তবলীগের সাথে সাথে নিজেদের কর্মকে এমনভাবে সাজাও যেমন সুন্দর ও আদর্শ নমুনা মহানবী (সা.) আমাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত করেছেন। যাতে তোমাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টায় উত্তম ফল প্রকাশ পায়। আর তোমরা খোদা তা'লার নিকট পুরুস্কার পাওয়ার যোগ্য হও।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেছেন, অবশ্যই স্মরণ রেখো! এই সিলসিলাহ আল্লাহ্‌ তা'লা নিজ হাতে এই যুগে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। যদি এই সিলসিলা প্রতিষ্ঠিত না হত তাহলে পৃথিবীতে ত্রিত্ববাদ বিস্তৃতি লাভ করত। এবং এক অদ্বিতীয় খোদার একত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকত না। অথবা এমন মুসলমান থাকত যারা তাদের অপবিত্র ও মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদে পড়ে ত্রিত্ববাদেরই সাহায্যকারী হত এবং তাদের বানানো উপাস্য ও খোদার আসনে আসীন 'মসীহ' এর জন্য রাস্তা প্রশস্ত করে দিত। এই সিলসিলা এখন কোন ষড়যন্ত্র বা শক্তি দ্বারা বিনষ্ট হবে না। এটা অবশ্যই বৃদ্ধি লাভ করবে এবং বিস্তৃত হবে এবং খোদা তা'লার বড় বড় কল্যাণ ও আশিসসমূহ এর উপর বর্ষিত হবে। যখন আমরা খোদা তা'লার কল্যাণ মণ্ডিত সজীব প্রতিশ্রুতি প্রতিনিয়ত পেতে থাকি আর তিনি আমাদের সর্বদা আশ্বস্ত করেন যে, 'আমি তোমাদের সঙ্গে আছি এবং তোমাদের আহ্বান পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দিব', তাহলে কারো তুচ্ছ মনে করায় এবং গালমন্দে আমরা বিচলিত হব কেন?

আর ইসলামের বিজয় লাভ তো অমোঘ ঐশী সিদ্ধান্তগুলোর অন্যতম। আল্লাহ্‌ তা'লা স্বীয় অবতীর্ণ শেষ-ধর্ম, পূণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ এবং আল্লাহ্‌ তা'লার সব চেয়ে প্রিয় নবী হযরত মহম্মদ (সা.) এর প্রতি তিনিযে ধর্ম অবতীর্ণ করেছেন তাকে নিঃসঙ্গ ও অসহায় ছেড়ে দিবেন বা এমন লোকদের হাতে ছেড়ে দিবেন যারা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে ভুলিয়ে দিয়ে এর সবটাকেই বক্র বানিয়ে দিবে আর এর মধ্যে বিদআত সৃষ্টি হবে এবং সকল প্রকার মন্দে ছেয়ে যাবে- এমনটা কখনই সম্ভব নয়। আল্লাহ্‌ তা'লা এমনই সেই যুগে হযরত মহম্মদ (সা.) এর প্রকৃত প্রেমিকের মাধ্যমে বিজয়ের উপকরণ জুগিয়েছেন।

সুতরাং আমাদের দায়িত্ব হল, বিশেষ করে আনসারুল্লাহ্‌র, নিজেদের অবস্থাকে ইসলামী শিক্ষার আদলে গড়ে তুলুনড়, মহানবী (সা.) এর অনুপম আদর্শের অনুসরণে সচেষ্ট হয়ে একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার জন্য নিজেদের সর্বশক্তি নিয়োজিত করুন এবং কুরআন শরীফের অনিন্দ্য সুন্দর নির্দেশনাগুলোর উপর আমল করে এর অনুশাসন নিজ হৃদয়ে নিজ জীবনেন প্রতিষ্ঠিত করুন। এই দৃষ্টান্ত নিজের পরিবার এবং বংশধরদের সামনে উপস্থাপন করুন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর বয়আতের অঙ্গীকারগুলো মান্য ও অনুশীলন করে প্রকৃত আনসার হোন। আল্লাহ্‌ তা'লা আমাদের সকলকে সেই সামর্থ্য দান করুন। আমীন।

যুগ ইমামের বাণী

যাঁর আশিস ও কল্যাণের ধারা সদা প্রবাহমান, তিনিই হলেন জীবিত নবী। (মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬২৯)

দোয়াপ্রার্থী: Qazi Abdur Rashid, Basantapur, 24 PGS (S)

(খুতবার শেষাংশ.....)

বিশ্বের সব দেশে শূরা আয়োজনের উদ্দেশ্য হলো আমাদের ব্যবহারিক অবস্থা সংশোধনের লক্ষ্যে পরিকল্পনা গ্রহণের পাশাপাশি এক আল্লাহ্‌র বাণী প্রচারের জন্য এবং বিশ্ব বাসীকে এক উম্মতে পরিণত করার মানসে, মহানবী (সা.)-এর পতাকাতলে সমবেত করার উদ্দেশ্যে এমন পরিকল্পনা গ্রহণ করা যা একটি বিপ্লব সাধন করবে।

সর্বদা স্মরণ রাখবেন, এ সমস্ত কর্ম সম্পাদনের জন্য তহবিল প্রয়োজন, অর্থের প্রয়োজন। কাজেই নিজেদের আর্থিক বাজেটও এমনভাবে প্রণয়ন করুন যেন ন্যূনতমখরচে আমরা সবচেয়ে বেশি লাভবান হতে পারি। জামা'তের অধিকাংশ সদস্যই দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষ। এজন্য চাঁদা থেকে যে আয় হয় তা ব্যয়ের এমন সুন্দর পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে যেন আমরা ন্যূনতম খরচে ধর্মের সর্বোচ্চ প্রচার ও প্রসারের কাজ সম্পাদন করতে পারি। এ কাজ আমরা তখনই করতে পারব যখন আমরা এই বাস্তবতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হব যে, আমাদেরকে তাকওয়ার পথে চলে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো পালন করতে হবে এবং ধর্মের সেবাকে ঐশ্বরিক অনুগ্রহ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। হযরত মসীহ্‌ মওউদ (আ.) তাকওয়ার পথে চলার উপদেশ দিতে গিয়ে এক জায়গায় বলেন, "يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَّيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ (আনফাল: ৩০) তিনি (আ.) আরো বলেন, وَيَجْعَلْ لَّكُمْ نُوْرًا تَمْشُوْنَ بِهٖ (আল হাদীদ: ২৯) অর্থাৎ হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা যদি তাকওয়ায় অবিচল থাকো এবং আল্লাহ্‌ তা'লার খাতিরে তাকওয়ার বৈশিষ্ট্যে প্রতিষ্ঠিত ও অটল থাকো তাহলে খোদা তোমাদের এবং অন্যদের মাঝে এক পার্থক্য সৃষ্টি করে দিবেন, আর সেই পার্থক্য হলো তোমাদেরকে এমন এক জ্যোতি দেওয়া হবে যে জ্যোতিতে তোমরা তোমাদের সকল পথে বিচরণ করবে। অর্থাৎ সেই জ্যোতি তোমাদের সকল কথা, কাজ এবং শক্তিবৃত্তি ও ইন্দ্রিয়তে সঞ্চারিত হবে। তোমাদের বোধবুদ্ধিতেও জ্যোতি থাকবে এবং তোমাদের একটি আনুমানিক কথায়ও জ্যোতি থাকবে। এছাড়া তোমাদের চো খেও জ্যোতি থাকবে আর তোমাদের কান ও তোমাদের জিহবা এবং তোমাদের বক্তব্য- এক কথায় তোমাদের প্রতিটি গতিস্থিতিতেজ্যোতি থাকবে আর যে পথে তোমরা হাঁটবে সেগুলোও জ্যোতির্ময় হয়ে যাবে। মোটকথা তোমাদের যত পথ রয়েছে, অর্থাৎ তোমাদের শক্তিবৃত্তির পথ ও তোমাদের ইন্দ্রিয়ের পথ, সবই জ্যোতিতে জ্যোতির্ময় হয়ে যাবে আর তোমরা আপাদমস্তক আলোর পথেই বিচরণ করবে। "

(আয়েনায়ে কামালাতে ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, ৫ম খন্ড, পৃ: ১৭৭-১৭৮)

আল্লাহ্‌ তা'লা আমাদের সবাইকে তাকওয়ার পথে প্রতিষ্ঠিত থেকে আমাদের দায়িত্বাবলীপালন করার তৌফিক দিন। তিনি আমাদের ভুলত্রুটি, ঘাটতি ও দুর্বলতা ঢেকে রেখে স্থায়ীভাবে আমাদের স্বীয় কৃপায় ধন্য করুন।

বদর পত্রিকায় নিজস্ব প্রবন্ধ প্রকাশে ইচ্ছুক বন্ধুরা ই-মেলের মাধ্যমে নিজেদের লেখা পাঠাতে পারেন।

Email: banglabadar@hotmail.com

(১ম পাতার শেষাংশ.....)

হয়েই থাকে যৌন-উত্তেজনার অনিয়ন্ত্রিত আবেগময় অবস্থায়। আর সেই সময় মানুষ কোন ধরণের ভাল মন্দ বিচার করতে পারে না যার পরিণামে একাধিক ব্যাধি বা আর্থিক ক্ষয়-ক্ষতির পরিস্থিতি তৈরী হয়। তাই বলা হয়েছে যৌন-বাসনা পূর্ণ করার এই পথ অত্যন্ত বিপজ্জনক।

এই বিষয়টি দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রেও প্রকাশ পেতে দেখা যায়। দেখা যায়, যদিও পুরুষ তার স্ত্রীর সঙ্গে যে সম্পর্ক স্থাপন করে, অনুরূপ সম্পর্ক ব্যাভিচারী বা ব্যাভিচারিনীর সঙ্গে স্থাপন করে। কিন্তু ব্যাভিচারের পরিণামে যে সব রোগব্যাধির সৃষ্টি হয় তা স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে হয় না, কিম্বা খুব কম হয়। পৃথিবীতে যত সংখ্যক মানুষ সিফিলিস ও গনোরিয়া রোগে আক্রান্ত হয় তাদের মধ্যে কতজনের এই সংক্রমণ নিজের স্ত্রীর কাছ থেকে হয়? হয়তো এক শতাংশও নয়। বাকি ৯৯ শতাংশ বা ততোধিক সংক্রমণ সেই সব রোগাক্রান্ত ব্যাক্তিদের সঙ্গে ব্যাভিচারের ফলে হয়ে থাকে। আর স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যে রোগটি সংক্রমিত হয়, বস্তুত সেটি পূর্বের কোনও ব্যাভিচারের পরিণামে হয়ে থাকে। অতএব, سَآءَ سَبِيْلًا বলার মাধ্যমে মানুষকে এক অত্যন্ত শক্তিশালী সত্যের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যা প্রত্যেকের সামনেই রয়েছে, কিন্তু সে বিষয়ের দিকে খুব মানুষের লক্ষ্য থাকে। (তফসীরে কবীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃ:৩২৮)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir